কুরআনে নৈতিক মূল্যবোধ

হারুন ইয়াহিয়া

অসীম দয়ালু, পরম করুণাময় আলাহর নামে

"পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে আলাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত আসমানী কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করাতে এবং আলাহর ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থদানে , যথাযথভাবে সালাত কায়েম করাতে এবং যাকাত দানে এবং প্রতিশ্রুতি পালনে, এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী এবং মুত্তাকী।" (কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭)

সূচীপত্র

ভূমিকা
১। আলাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা
২। আলাহকে যথাসম্ভব ভয় করা
৩। ভাগ্য
৪। আলাহর উপর নির্ভর করা
৫। চিন্তা-ভাবনা
৬। সতর্ক হওয়া
৭। সবকিছুর মাঝে ভালত্ব
৮। মৃত্যু নিকটবর্তী
৯। শয়তানের অবিরাম প্রচেষ্টা
১০। আত্মা স্বভাবত:ই মন্দ প্রবণ
১১। আলাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া
১২। দোয়া
১৩। তওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া
১৪। আমৃত্যু ধৈর্যধারণ করা
১৫। আলাহর সাহায্য
১৬। মু'মিনদের জন্য কোন হতাশা নয়
১৭। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুর মূল্যায়ন করা
১৮। আলাহ সব হৃদয়ের রহস্য জানেন
১৯। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন
২০। সব সম্পদের প্রকৃত মালিক
২১। আলাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া
২২। আমাদের সার্বক্ষণিক পরীক্ষা
২৩। আলাহ কারো উপর তার সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপান না
২৪। অবিশ্বাসীদের প্রতি কোন ভালবাসা নয়
২৫। কোন কিছুকে আলাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে প্রিয় মনে না করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা
২৬। কোন দুর্বলতা নয়, দুঃখ নয়, নয় কোন হতাশা
২৭। সালাতে বিনয়াবনত হওয়া
২৮। আলাহর প্রশংসা করা
২৯। প্রতিকূল অবস্থায় আলাহকে স্মরণ করা
৩০। আলাহর কালাম তিলাওয়াত করা
৩১। অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা
৩২। মধ্যপন্থী হওয়া
৩৩। ফেরেশতারা সাক্ষী

৩৪। লেন-দেন লিখে রাখা
৩৫। এমন কিছু বলা যা কেউ নিজে করবে না
৩৬। মু'মিনদের সাথে কোন কলহ নয়
৩৭। কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তানের বির‍ুদ্ধে আলাহর আশ্রয় চাওয়া
৩৮। বিবেচক হওয়া
৩৯। অজ্ঞদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা
৪০। অজানা বিষয় সম্পর্কে তর্ক না করা
৪১। কোন উপহাস নয়
৪২। মু'মিনদের ডাক নামে না ডাকা
৪৩। বিশ্বস্ত হওয়া বা আমানতদার হওয়া
৪৪। মায়াময় বিশ্ব

ভূমিকা

যে সমাজে আমরা বাস করি তার নৈতিক মূল্যবোধ বিকৃত বলা যায়। এ সমস্ত নৈতিক বিধি-বিধান, যা, মানুষের স্বার্থান্ধ বৃত্তি এবং লোভের ফসল, তা কেবল স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, বক্রোক্তি, রূঢ়তা এবং নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। লোকে বিশ্বাস করে, তাদের জীবনমান উন্নত করতে হলে তাদের অন্যকে ফাঁকি দিতে বা প্রতারণা করতে হবে।

যাই হোক না কেন, এগুলি সে সমস্ত মূল্যবোধ নয় যা আলাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল-কুরআন মানুষকে মর্যাদাবান, ভদ্র, বিশ্বস্ত, দয়ালু, বিশ্বাসী, পরিপক্ক এবং দায়িত্ববান হতে নির্দেশ দেয়। এমনকি কুরআন আমাদের কাছে বর্ণনা করে কিভাবে আমাদের হাঁটা উচিত : "তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নিও না লোকেদের কাছ থেকে অহঙ্কারভরে, আর না চলাফেরা করবে পৃথিবীর বুকে দুর্বিনীতভাবে, নিশ্চয়ই আলাহ উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৮)

এই কারণে মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে আলাহর নির্দেশিত উত্তম নীতিসমূহ কার্যকর করা।

যদিও আজ মুমিনরা এমন একটি দুশ্চরিত্র সমাজে বাস করে, যেখানে এই সমস্ত ঐশ্বরিক নীতিমালা পরিত্যক্ত হয়েছে। যে কারণে তাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে এই বিকৃত ও আদিম সংস্কৃতির অর‍ুচিকর প্রভাবের বির‍ুদ্ধে। তাদের অনবরত নিজেদের বিচার করে চলতে হবে এই সমাজের ভিতরে, যাতে তারা আজকের অধঃপতিত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত না হয় এবং কুরআনের নৈতিক শিক্ষাসমূহ প্রয়োগ করতে পারে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি মু'মিনদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে তারা কুরআনের মূল শিক্ষা ভুলে না যায়, যা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে, এ সমস্ত নৈতিক বিধানসমূহ এবং যা মু'মিনদের ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আলাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা

আলাহর সত্যিকার গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে- "আলাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে বা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনে বিস্তৃত এবং এ সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কোন ক্লান্তি আসে না। তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।" (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫)

"আলাহই সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও, ওগুলোর অনুরূপভাবে, এসবের মাঝে তাঁর আদেশ নাযিল হয় যাতে তোমরা বুঝতে পার যে আলাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" (সূরা তালাক, ৬৫ : ১২)

বস্তুতঃ অধিকাংশ মানুষই উপরের আয়াতসমূহে বর্ণিত আলাহর গুণাবলীকে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাঁর অসীম শক্তি ও মহত্ত্বকে বুঝতে পারে না। তারা নিজেদের বানানো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এবং ভাবে যে, আলাহ এই মহাবিশ্বের সুদূর কোণে অবস্থান করেন এবং "জাগতিক ব্যাপার"সমূহে কদাচিৎ জড়িত হয়ে থাকেন। এসব লোকের সীমিত বোধশক্তির উলেখ রয়েছে কুরআনে, সূরা হাজ্জ-এর ৭৪ নং আয়াতে- "আলাহ সম্পর্কে তারা কোন সঠিক ধারণা রাখে না, নিশ্চয়ই আলাহই শক্তিমান এবং তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপদানে সক্ষম।"

আলাহর শক্তির সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা হচ্ছে বিশ্বাসের সিঁড়ির প্রথম ধাপ। সত্যিকার বিশ্বাসীরা আলাহ সম্পর্কে তাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিকৃত ধারণা পরিত্যাগ করে এবং এসব বিকৃত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে একথার মাধ্যমে - "আমাদের মাঝে কিছু সংখ্যক নির্বোধ ছিল, যারা আলাহর বির‍ুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা উচ্চারণ করতো।" (সূরা জ্বিন, ৭২ : ৪)

বিশ্বাসীরা আলাহকে কুরআনের বর্ণনার অনুরূপভাবে বিশ্বাস করে। তারা বর্হিজগত ও অন্তর্জগত উভয় জগতেই আলাহর নিদর্শন সমূহ পরীৰা-নিরীৰা করে এবং এভাবে আলার মহৎ শিল্প ও শক্তি সম্পর্কে বুঝতে শুরু করে।

কিন্তু বিশ্বাসীরা যদি আলাহকে উপেৰা করে এবং তাঁর ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা অনৈতিক বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, বিশেষতঃ কোন সংকটময় মুহূর্তে। সূরা আলে-ইমরান এর ১৫৪ নং আয়াতে আলাহ এ ব্যাপারটিকে একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসাবে উলেখ করছেন, সেসব বিশ্বাসীদের সম্পর্কে যারা যুদ্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল, এবং "যারা তাদের নিজেদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, আলাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল, জাহিলিয়াতের ধারণা।"

একজন বিশ্বাসী কখনও এমন ভুল করতে চাইবে না, সেজন্য তাকে তার হৃদয়কে অজ্ঞতাপূর্ণ সব ধারণা থেকে মুক্ত রাখা উচিত, এবং কুরআনের বর্ণনা অনুসরণ করে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করা উচিত।

আলাহকে যথাসম্ভব ভয় করা

সবকিছুর মূলে রয়েছে আলাহকে ভয় করা। আলাহর ভয় যার যত বেশি, আলাহর কাছে সে তত বেশি সম্মানিত। কুরআনে নবীদের উদাহরণ রয়েছে, যাঁদের সাথে নিজেদের তুলনা করে মু'মিনরা বুঝতে পারে যে তারা সত্যিই তাদের আলাহ-ভীতি বাড়াতে পারে।

আলাহ চান যে মানুষ তাঁকে যথাসম্ভব বেশি ভয় করুক। সর্বশক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিভিন্ন উপায় রয়েছে, যেমন আলাহর পথে ব্যয় করা, ভাল কাজ করা, রাসূল (সঃ)-কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, আলাহর বিধান সমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি।

"অতএব ভয় কর আলাহকে যতটুকু সম্ভব , শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর এবং দান কর নিজেদের আত্মার কল্যাণের জন্য। যারা তাদের অন্তরের কলুষতামুক্ত, তারাই সফলকাম।" (সূরা-তাগাবুন, ৬৪ : ১৬)

"হে মু'মিনগণ! আলাহকে ভয় কর, তাঁকে যতটুকু ভয় করা উচিত, এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

ভাগ্য

বিশ্বের কোন কিছুই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়নি। কুরআনে যেমন বলা হয়েছে : "তিনিই সব ব্যাপারের নিয়ন্তা" (সূরা রা'দ, ১৩ : ২)। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: "তাঁর অজান্তে গাছের একটি পাতাও পড়ে না" (সূরা আনআম, ৬ : ৫৯)। আলাহই সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, কিভাবে সব কিছুর শুরু হবে এবং তার পরিণতি কি হবে। বিশ্বের সমস্ত নৰত্রের প্রতিটি নড়াচড়া আলাহই নির্ধারণ করেন, নির্ধারণ করেন পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত বস্তুর প্রত্যেক অবস্থা, কিভাবে একজন বাঁচবে, একজন কি বলবে, কি কি ঘটনার সম্মুখীন হবে, যেমন নিচের আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : "নিশ্চয়ই আমরা সমস্ত বস্তুকে 'কদর' (সৃষ্টির পূর্বে আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য) সহ সৃষ্টি করেছি।" (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৯)

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদই আসে না তা ছাড়া, যা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা তা অস্তিত্বে আনয়নের পূর্বে। নিশ্চয়ই এটা আলাহর জন্য সহজ।" (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২)

মু'মিনদের উচিত এই বিশাল বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এর ফলস্বরূপ কখনই মূর্খদের মত আচরণ করা উচিত নয় যারা একে প্রত্যাখ্যান করে। জীবন শুধুমাত্র ভাগ্যকে অনুসরণ করা, একথা বোঝার পর তারা কোন কিছুতেই হতাশ হয় না বা ভয় পায় না। তারা যেন নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মত দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী হয় যিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, "দুঃখিত হয়ো না, আলাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা তাওবা, ৯ : ৪০), যখন তাঁর সাথী ভয় পাচ্ছিলেন যে তাঁদের হত্যা করতে উদ্যত মুশরিকরা তাঁদের খোঁজ পেয়ে যাবে।

আলাহর উপর নির্ভর করা

যেহেতু আলাহই একমাত্র সিদ্ধান্ত দাতা, প্রত্যেক ঘটনাই বিশ্বাসীদের অনুকূলে: সবকিছুই দ্বীনের জন্য এবং বিশ্বাসীদের আখেরাতের জীবনের কল্যাণের জন্য পরিচালিত। বিশ্বাসীগণ তাদের অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে সেখানে তাদের জন্য প্রতিটি ঘটনার শেষেই রয়েছে কল্যাণ। এজন্যই তারা সর্বান্তকরণে আলাহর উপর নির্ভর করে। তিনি একক এবং একমাত্র রৰক। বিশ্বাসীদের যা করা উচিত তা হচ্ছে আলাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করা, নিজ দায়িত্ব পালন করা কিন্তু ফলাফলের জন্য আলাহর উপর নির্ভর করা। পরবর্তী আয়াতগুলি এই রহস্য প্রকাশ করছে যা বিশ্বাসীদের অজানা।

"...যে আলাহকে ভয় করে, আলাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। যে ব্যক্তি আলাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। বস্তুত সবকিছুর জন্যই আলাহ একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩)

“বল! ‘আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, যা আলাহ্ আমাদের জন্য রেখেছেন তা ছাড়া : তিনি আমাদের রৰক : আলাহর উপরই মু’মিনদের ভরসা করা উচিত।” (সূরা তাওবা, ৯ : ৫১)

বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কি বলবে, তাও কুরআনে উলিখিত হয়েছে:

“এবং আমরা কেন আলাহর উপর ভরসা করব না যখন তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছো, সেজন্যে আমরা সবুর করব এবং যারা ভরসাকারী, তাদের আলাহর উপরেই ভরসা করা উচিত।” (সূরা ইবরাহীম, ১০ : ১২)

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে: “যদি আলাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন, কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ হতে পারবে না , আর যদি তিনি তোমাদের ভুলে যান, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আলাহর উপরই মু’মিনদের ভরসা করা উচিত।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৬০)

চিন্া ভাবনা

কুরআনে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা আসলে আলাহর নিদর্শনসমূহ বুঝতে পারে না এবং সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনাও করে না। বিশ্বাসীদের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এসব নিদর্শনসমূহ এবং প্রমাণাদি বুঝবার ৰমতা। সে জানে যে এসব অনর্থক সৃষ্টি হয়নি, এবং সর্বত্র সে আলাহর শক্তি এবং মহৎ শিল্পের প্রকাশ দেখতে পায় এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর নানা পথের খোঁজ করে। সে সেইসব বিবেকবান মানুষদের একজন “যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আলাহকে স্মরণ করে ও চিন্া-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (এবং বলে) : ‘হে আমাদের রব! তুমি এ সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি করনি! সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি আগুনের আযাব থেকে রৰা কর।’’’ (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৯১)

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে, “তুমি কি কর্ণপাত করবে না”, “...চিন্াশীল মানুষদের জন্য এতে রয়েছে চিন্ার খোরাক” এ ধরনের বর্ণনাসমূহ আলাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্াভাবনা করার উপর গুর্ত্ব দেয়। আলাহ্ অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা নিয়ে চিন্া গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। যা কিছু আমরা আকাশে ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মাঝে দেখি, তা আলাহর সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ এবং সেজন্য তা চিন্ার খোরাক হওয়া উচিত। একটি আয়াতে আলাহর এই রহমতের দৃষ্টান্ রয়েছে:

“এর দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করেন, জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর এবং সব ধরনের ফল , বস্তুতঃ এটি চিন্াশীলদের জন্য একটি নিদর্শন।” (সূরা নাহল, ১৬ : ১৩)

আসুন, আমরা একবারের জন্য উপরোলিখিত একটি জিনিস সম্পর্কে চিন্া করি : খেজুর গাছ। এই গাছটি, আমাদের জানা মতে, একটি বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। এই ছোট বীজ (একটি বীজ আকৃতিতে এক কিউবিক সেন্টিমিটারও নয়) থেকে চার-পাঁচ মিটার লম্বা এবং শত শত কেজি ওজনের বিরাট এক কাষ্ঠল বৃৰ উৎপন্ন হয়। এই বীজটি বিরাট বৃৰে পরিণত হতে একমাত্র যে জিনিসটি ব্যবহার করে, তা হচ্ছে মাটি, যেখানে সেটিকে বপন করা হয়েছিল।

কিভাবে বীজটি বৃৰে পরিণত হতে শিখল? কিভাবে এটি কাঠ তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি থেকে আলাদা করে গ্রহণ করে নেবার “চিন্া” করতে শিখল? কিভাবে এটি তার বিশেষ আকার ও কাঠামো কি হবে তা জানল? শেষ প্রশ্নটি বিশেষ গুর্ত্বপূর্ণ, কারণ এটি সাধারণ কাঠ নয় যা বীজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি একটি জটিল জীবন্ সত্তা যার মূল মাটি থেকে বিভিন্ন বস্তু আত্মস্থ করেছে, যার শিরা ও শাখা নিপুণভাবে সুবিন্য্। একজন মানুষ একটি গাছের ছবি আঁকতে গেলেও তাকে বেশ চেষ্টা করতে হবে, অথচ একটি সাধারণ বীজ শুধুমাত্র মাটির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেই এমন একটি চূড়ান্ জটিল বস্তু তৈরি করতে পারে।

এই পর্যবেৰণ থেকে সিদ্ধান্ে আসা যায় যে একটি বীজ অত্যন্ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, আমাদের চেয়েও। অথবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে বীজটির কার্যকলাপে একটি বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে। কিন্তু এই বুদ্ধিমত্তার উৎস কি? একটি বীজের কিভাবে এমন বুদ্ধি ও স্মৃতি থাকা সম্ভব?

নিঃসন্দেহে, প্রশ্নটির একটিমাত্র উত্তর রয়েছে: বীজটি একটি বৃৰে পরিণত হওয়ার গুণসম্পন্ন হয়েই তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ এভাবেই এটিকে ‘প্রোগ্রাম’ করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি বীজ আলাহ্ কতৃক পরিবেষ্টিত এবং তাঁর জ্ঞাতসারে বেড়ে উঠছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

“তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে, রয়েছে সম্পদ ভাণ্ডার, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। জলে ও স্থলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর অজান্ে গাছের একটি পাতাও ঝরে না: মৃত্তিকার অন্ধকারে নেই কোন শস্যকণা অথবা কোন তাজা বা শুষ্ক বস্তু, কিন্তু সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে স্পষ্ট কিতাবে।” (সূরা আনআম, ৬:৫১)

আলাহই বীজ সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি করেছেন। আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

“নিশ্চয় আলাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী, তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনিই আলাহ্, অতঃপর তোমরা কিভাবে বিভ্রান্ হচ্ছ?” (সূরা আনআম, ৬ : ৯৫)

মহাবিশ্বে আলাহর সৃষ্টি অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে বীজ একটি ৰুদ্র উদাহরণ মাত্র। মানুষ যদি শুধু মনোযোগের সাথে নয়, সর্বান্ঃকরণে চিন্া করতে শুর্ করে, এবং নিজেদেরকে ‘কেন’ এবং ‘কিভাবে’ এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে সমস্ মহাবিশ্বই আলাহর অস্িত্ব ও ৰমতার প্রমাণ।

সতর্ক হওয়া

আমরা শুর¯তে যেমন বলেছিলাম, আলাহ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিদর্শন দেখানোর জন্য।

আসলে অবিশ্বাসীরা এ সত্য বুঝতে অৰম, কারণ এই ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার ৰমতা তাদের নেই। কুরআন যেমন বলছে : "তাদের চোখ আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না।" (সূরা আরাফ, ৭ : ১৭৯) তাদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা দিয়ে তারা এই গুর¯ত্বপূর্ণ বাস¯বতাকে উপলব্ধি করার মত ৰমতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

মু'মিনরা এই "অন্ধ"দের দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তারা উপলব্ধি করে এবং মেনে নেয় যে আলাহ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ও হেকমতে এই সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বাসই ঈমানের প্রথম ধাপ। যেহেতু ঈমান এবং জ্ঞান একে অপরের সমান¯রালে বৃদ্ধি পেতে থাকে, মু'মিনরা আলাহর সৃষ্টির প্রতিটি অংশ সনাক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করতে শুর¯ করে।

ইসলামী ঐতিহ্যে ঈমান বৃদ্ধির তিনটি স¯র রয়েছে: ইলমুল ইয়াকীন (জানা), আইনুল ইয়াকীন (দেখা) এবং হাক্কুল ইয়াকীন (অভিজ্ঞতা লাভ করা)।

এই স¯রগুলি ব্যাখ্যার জন্য বৃষ্টিপাতের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বৃষ্টি পড়ছে, একথাটি তিনভাবে জানা যেতে পারে। প্রথম ধাপে (ইলমুল ইয়াকীন) একজন বাড়িতে বসে আছে, জানালাগুলি বন্ধ, কেউ বাইরে থেকে এসে তাকে বলল যে বৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রথমোক্ত জন তাকে বিশ্বাস করল। দ্বিতীয় আইনুল ইয়াকীন হচ্ছে চাৰুষ দেখার পর্যায়। লোকটি জানালার কাছে গেল, পর্দা তুললো এবং দেখলো বৃষ্টি হচ্ছে। হাক্কুল ইয়াকীন এর পর্যায়ে সে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে গেল এবং সে বুঝলো যে সে বৃষ্টিতে ভিজছে।

ইলমুল ইয়াকীন এর স¯র থেকে আইনুল ইয়াকীন এর স¯রে যেতে বা এর পরবর্তী স¯রে যেতে যা কিছু করণীয়, তাতে সতর্কতা অবলম্বন হচ্ছে একটি সক্রিয় ইবাদত।

আলাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যৰ করা এবং অবিশ্বাসীদের মত এ ব্যাপারে অন্ধ না হওয়ার জন্য উচ্চস¯রের মনসংযোগ প্রয়োজন। কুরআনে বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে, তাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আলাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেৰণ ও লৰ্য করতে এবং এটা শুধুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করেই করা সম্ভব।

"তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্নকারী?" (সূরা ওয়াকেয়া, ৫৬ : ৬৩-৬৪)

"তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি?" (সূরা ওয়াকেয়া, ৬ : ৬৮-৬৯)

এবং আরেকটি আয়াতে আলাহ বলছেন যে অন্ধ কখনো চৰুষ্মানের সমান হতে পারবে না এবং জিজ্ঞাসা করছেন "তোমরা কি তবে চিন¯া করবে না?" (সূরা আনআম, ৬ : ৫০)

সকলেরই উচিত আলাহর নিদর্শনসমূহ চেনার প্রশিৰণ নেওয়া এবং সবসময়ে তা স্মরণে রাখা। তা না হলে মন নানা বিষয়ে আগ্রহী হবে, বিষয় থেকে বিষয়ান¯রে ছুটে যাবে, অহেতুক জিনিসের চিন¯ায় সময় নষ্ট করবে। এটা এক ধরনের অসচেতনতা, তুমি কখনোই তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না যদি তুমি আলাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে না পারো। তুমি কখনোই কোনো বিষয়ে মনোযোগী হতে পারবে না। সত্যি বলতে কি তুমি কখনোই ঘটনার পেছনের সত্যকে বুঝতে পারবে না এবং ঘটনাপ্রবাহের গতিকে প্রভাবিত করার দৰতাও অর্জন করতে পারবে না। অপরপৰে, তোমার মন ইতঃস¯ত বিৰিপ্ত ঘটনা দিয়ে পরিচালিত হবে। সব সময় তুমি 'বিভ্রান¯' থাকবে, যা কখনো একজন মু'মিনের গুণ নয়, বরং অবিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য।

"... যে কেউ আলাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিৰেপ করল।" (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩১)

অপরদিকে, মু'মিনরা তারাই, যারা তাদের মনকে আরো ভালভাবে আলাহকে বোঝার জন্য চেষ্টায় রত করে এবং আলাহর দ্বীনকে আরও উত্তম উপায়ে খেদমতের কাজে লেগে থাকে। তারা তাদের মনকে অর্থহীন চিন¯া থেকে মুক্ত রাখে এবং যখন তারা শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করে, তারা নিজেদেরকে তার হাত থেকে রৰা করে, ঠিক যেভাবে আলাহ কুরআনে বলেছেন:

"নিশ্চয়ই যারা ধার্মিক, তাদের মনে শয়তানী চিন¯া অনুপ্রবেশ করার সাথে সাথেই তারা আলাহকে স্মরণ করে, এবং তখন তারা সত্যকে দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০১)

সুতরাং, মু'মিনদের উচিত তাদের মনকে অর্থহীন চিন¯া থেকে মুক্ত রাখা এবং কখনো তাদের চারপাশের ঘটনাবলীর সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া, সবসময়েই তাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

সবকিছুর মাঝে ভালত্ব

সমস্ত কিছু সৃষ্টির পেছনে রয়েছে প্রজ্ঞা এবং সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য। এই পরম লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, সংঘটিত প্রতিটি ব্যাপারেই বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে উপকার। কারণ বিশ্বাসীদের পক্ষে আছেন আলাহ এবং তিনি কখনোই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেবেন না।

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম দৃষ্টিতে মু'মিনদের কাছে অনুকূল মনে নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, একজনের বোঝা উচিত যে আপাতঃ দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ঘটনাও, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্রের কথা, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য উত্তম হিসাবে প্রতিভাত হবে। আলাহ দ্রুত হোক বা দেরীতে হোক তাঁর বদান্যতা উপভোগ করতে দেবেন, যাতে মু'মিনরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে সবকিছুতেই ভালত্ব রয়েছে।

কুরআনে এ ধরনের পরিস্থিতির বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, ইউসুফ (আঃ) এর জীবন এর মাঝে একটি অন্যতম উলেখযোগ্য। তাঁর শৈশবে ইউসুফ তাঁর ভাইদের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, একসময় তিনি অভিযুক্ত হন এবং কারারুদ্ধ হন যদিও তিনি নির্দোষ ছিলেন। ঈমানহীন এক ব্যক্তির জন্য ঘটনাগুলো চরম দুর্ভাগ্য বলেই প্রতীয়মান হবে। তবুও, ইউসুফ সবসময় মনে রাখতেন যে এগুলি কেবল আলাহর নির্দেশেই ঘটতে পারে এবং সবকিছুই নিশ্চিত ভালর দিকেই মোড় নেবে। এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আলাহ 'দুর্দশা' কে উত্তম পরিণতিতে রূপ দিলেন, ইউসুফ কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন এবং সময়ে সে দেশের শাসনকর্তা হয়েছিলেন।

ইউনুসের (আঃ) পরিস্থিতিও ভিন্নতর নয়। তিনি একটি বোঝাই জাহাজে পালিয়েছিলেন, যেখানে, তাঁকে স্থান দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য তাঁকে লটারী করতে হয়েছিল। যখন লটারী তাঁর প্রতিকূলে গেল, তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো এবং একটি দানবাকৃতির মাছ তাঁকে গিলে ফেললো। কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং "এক লাখ বা তারও বেশি লোক-সম্বলিত একটি জাতি"র কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, শুধুমাত্র এজন্য যে তিনি আলাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছিলেন।

"যদি তিনি আলাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১৪৩-১৪৮)

কুরআনের এ সমস্ত উদাহরণই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যা 'দুর্ভাগ্য' বলে মনে হয়, মু'মিনদের জন্য সত্যিই তা নয়। যদি সে আলাহর উপর নির্ভর করে, তাঁর কাছে আশ্রয় চায়, এবং শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চায়, তাহলে কোন কিছুই তার জন্য দুঃখের বা আফসোসের কারণ হবে না। আলাহ কিছু সংকট অবশ্যই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তা শুধু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং বিশ্বাসীদের আনুগত্য ও ঈমানকে মজবুত করার জন্য।

অবিশ্বাসীদের জন্য এর বিপরীত কথাটাই প্রযোজ্য। পার্থিব জীবনে কোনকিছুই তাদের জন্য ভাল হতে পারে না। যা কিছু তাদের চোখে আনন্দদায়ক বা মনোরম মনে হয়, আসলে তা 'দুর্ভাগ্য' এবং এগুলি তাদের আখিরাতের শাস্তিকে আরো বাড়িয়ে দেবে। যা কিছু তারা অন্যায়ভাবে অর্জন করে সবটুকুই তাদের হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকে, এবং সেজন্য তারা শেষ পর্যন্ত দায়ী হবে। এ সম্পর্কে কুরআনে আলাহর আদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আছে:

"আলাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আলাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আলাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৮০)

মৃত্যু নিকটবর্তী

ধর্মহীন সমাজের সদস্যরা মূলতঃ অজ্ঞ, অবজ্ঞাকারী ও স্থূল। তাদের জীবন সাধারণ বিবেকবোধ অথবা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অপরপক্ষে, তারা অসার ও মিথ্যা বিশ্বাসের সাথে সহাবস্থান করে, এবং এমন সব অনুমানের অনুসরণ করে যা স্ববিরোধী। এসব বিশ্বাসের একটি হচ্ছে মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ধারণা। তারা মনে করে মৃত্যু এমন একটি ব্যাপার যা চিন্তাযোগ্য কিছু নয়।

আসলে তারা যা চায় তা হচ্ছে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তা থেকে পালিয়ে আসা। তারা মনে করে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা না করলে তাকে এড়ানো যাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে সেই উটপাখীর মত ব্যাপার, যে বিপদ এড়ানোর জন্য বালিতে মাথা গুঁজে রাখে। বিপদকে উপেক্ষা করলে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় না। অন্যদিকে, যে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, সে অবশ্যই বিপদের মুখোমুখি হবে, কিন্তু সেজন্য কোন প্রস্তুতি না থাকলে আঘাত আরো বেশি পাবে-যা সেই সব মু'মিনদের বিপরীত, যারা চিন্তা করে এবং নিজেদের এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত করে, যার সত্যতা দুনিয়ার আসা সব মানুষেরই জানা। আলাহ সেজন্য নিম্নোক্ত আয়াতে অবিশ্বাসীদের তিরস্কার করছেন:

"যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা ফিরে যাবে সেই আলাহর কাছে যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, এবং তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন সে সব কর্ম, যা তোমরা করতে।" (সূরা জুমুআ, ৬২ : ৮)

মৃত্যু কোন 'দুর্যোগ' নয় যে তা ভুলে যাওয়া যাবে, বরং তা একটি গুর ত্বপূর্ণ শিক্ষা যা মানুষকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে শিখায়। সুতরাং এটি একটি গভীর চিন্তার বিষয়। মু'মিনরা বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতার সাথে এই বিরাট বাস্তবতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করে। সমস্ত মানুষ কেন একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বাঁচে এবং তারপর মৃত্যুবরণ করে? সমস্ত সৃষ্টবস্তুই মরণশীল এবং এটা প্রমাণ করেছে যে তারা আলাহর শক্তিহীন এবং অক্ষম বান্দা। আলাহই জীবনের একমাত্র মালিক, সমস্ত সৃষ্টি প্রাণ লাভ করেছে তাঁর ইচ্ছায়, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাতেই তারা মৃত্যুবরণ করবে। এ সম্পর্কে কুরআন ঘোষণা করছে: "পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে একমাত্র চিরস্থায়ী তোমার প্রভুর সত্তা মহিমা, বদান্যতা এবং সম্মানে পরিপূর্ণ।" (সূরা রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭)

প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু কেউ বলতে পারে না কোথায় এবং কখন তা ঘটবে। পরবর্তী মুহূর্তে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। সেজন্য মু'মিনরা যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত অবস্থায় চলবে। মৃত্যু চিন্তা মু'মিনদের বিশ্বস্ততা ও আলাহ-ভীতি বাড়িয়ে দেয় এবং তারা সবসময় তাদের অপেক্ষমান ভবিষ্যতের ব্যাপারে সচেতন থাকে।

কুরআনে, সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখার তাৎপর্য নিচের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে:

"তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি অমরত্ব দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হবে? প্রতিটি আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর আমরা তোমাদের ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩৪-৩৫)

শয়তানের অবিরাম প্রচেষ্টা

আলাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন তাঁকে সেজদা করতে, তারা সকলেই সেজদা করলো, শয়তান ছাড়া, সে তখন থেকে অভিশপ্ত হিসাবে পরিগণিত হলো। শয়তান তখন আলাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করলো। এজন্য যে, সে যেন মানুষকে সীমালংঘনে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পায়। অনুমোদন পাওয়ার পর সে নিজেকে নিয়োজিত করলো মানুষকে আলাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার কাজে: "সে বললো : আপনি আমাকে যেমন বিভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই মানুষের জন্যে আপনার সকল পথে বসে থাকব। এরপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬-১৭)

"আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের ভিতর মিথ্যা আকাঙ্খার সৃষ্টি করব, তাদের গবাদি পশুর কর্ণচ্ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আলাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আলাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।" (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১১৯)

শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে যে বেখবর, সে নিজেকে তার বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে না এবং সহজেই প্রতারিত হয়। সেজন্যই কুরআনের আদেশ অনুসারে সকল মু'মিনকে অবশ্যই শয়তানের বিরুদ্ধে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে:

"শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার অনুসারীদের আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৬)

শয়তান সম্পর্কে যাদের সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত তারা হচ্ছে মু'মিনরা, কেননা তারাই শয়তানের লক্ষ্যস্থল। অবিশ্বাসীদের সীমালঙ্ঘনকারী বানানোর তার তেমন প্রয়োজন নেই, কারণ তারা ইতোমধ্যেই তার নিজস্ব সৈনিকে পরিণত হয়েছে। অতএব সে তার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে মু'মিনদের দুর্বল করতে যাতে তাদেরকে আলাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখা যায়। সেজন্য মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আলাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের উপর না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আলাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আলাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ২১)

আলাহ যেভাবে কুরআনে বলেছেন, সত্যিকার বিশ্বাসীরা কখনোই শয়তানের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কিন্তু যারা দুর্বল-চরিত্র ও গাফেল, তারা সহজেই তার ধোঁকায় বিভ্রান্ত হতে পারে। আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে শয়তান মন্দকে উস্কে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মু'মিনদের উচিত সর্বদা সতর্ক থাকা এবং সবসময় আলাহকে স্মরণ রাখা।

আত্মা স্বভাবতঃই মন্দপ্রবণ

আরেকটি শত্রু, যার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, আমাদেরই ভিতরে বাস করে। আলাহ মানুষের ভিতরে ভাল ও মন্দ উভয়েরই প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের ভিতরের মন্দ প্ররোচনা সব সময় শয়তানের জন্য কাজ করে। কুরআন আমাদের আত্মার উভয় দিককে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে পবিত্র করে, সেই সফলকাম। এবং যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।" (সূরা আশ-শামস, ৯১ : ৭-১০)

নিজেদের অন্তরের এই দুষ্প্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের সচেতন হওয়া উচিত এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। আত্মার দুষ্ট প্রবণতাকে অস্বীকার করে এর প্রভাব থেকে বাঁচা যাবে না, এবং আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

মু'মিনদের সেজন্য কখনোই উচিত নয় নিজেদের সম্পূর্ণ পবিত্র দাবী করা, বরং তাদের নিজ আত্মার অসার প্ররোচনা সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার। ইউসুফের (আঃ) স্বীকারোক্তি – "আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় – তোমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৩)

– সবসময় মনে রাখা উচিত যথাযথ মানসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে।

মানুষকে সতর্কতার সাথে আত্মার দুর্বলতা সন্ধান করতে হবে এবং ভাল কাজ করার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করতে হবে, কারণ অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে "মানবাত্মা লোভ-লালসা দ্বারা দোদুল্যমান।" (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৮)

এই লোভ মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কুরআনে তাও বলা হয়েছে। আদমের একজন সন্তানের অন্তরই তাকে তার ভাইকে হত্যার প্ররোচনা দিয়েছিল: "অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করলো। অনন্তর সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (সূরা আল-মায়েদা, ৫ : ৩০) একই মন্দের আকর্ষণে সামিরী মূসার কওমকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বিপথগামী করেছিল। সামিরী বলেছিল: "... আমার অন্তর আমাকে এরকমটাই করতে বলেছিলো।" (সূরা তা-হা, ২০ : ৯৬)

মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে অন্তরের মন্দকে দমন করা:

"যারা তাদের নিজ অন্তরের নীচতা থেকে মুক্ত, তারাই সফলতা অর্জন করেছে।" (সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৯)

"যে তার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের আত্মাকে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী থেকে মুক্ত রাখে, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।" (সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ৪০-৪১)

মু'মিনের জন্য বড় জিহাদ হচ্ছে তার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। তাকে নিজের সম্পর্কে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার কোন অনুভূতি ও ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য এবং কোনগুলি মন্দ। তাকে তার নফসের মন্দ প্রবৃত্তিসমূহের তাড়নার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, যেমন, স্বার্থপরতা, হিংসা ঔদ্ধত্য এবং লোভ।

আমাদের নফস আমাদের ভেতরে অসার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ লালন করতে চায়। তারা আমাদের কুমন্ত্রণা দেয় যে, আমরা আরো টাকা আরো প্রতিপত্তি পেলেই কেবল তৃপ্তি পাব। আসলে, এসব আনন্দ কখনোই সত্যিকার অর্থে কোন মু'মিনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আমরা যত বেশি টাকার মালিক হব, ততই আরো বেশি পেতে চাইব। নানাভাবে আমাদের নফস আমাদেরকে অতৃপ্ত বন্যপশুর মত আচরণ করতে শিখাবে।

আমাদের আত্মা কেবল তখনই তৃপ্ত হবে যখন আমরা নিজেদের আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করব, নিজেদের সংকীর্ণ বাসনার দাসত্বে নয়। আমাদেরকে আল্লাহর দাস হিসাবেই তৈরি করা হয়েছে: "...নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিকরের মাঝেই রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি।" (সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৮)

সেজন্যই শুধুমাত্র প্রকৃত মু'মিন বান্দারাই পরিপূর্ণভাবে অন্তরের প্রশান্তি লাভ করে। কারণ তারা মন্দ থেকে দূরে থাকে, আত্মার নৈতিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করে।

"সৎকর্মপরায়ণ আত্মাকে তার রবের পক্ষ থেকে বলা হবে, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি এমনভাবে তোমার রবের দিকে চল যে তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তুমি তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'" (সূরা আল-ফজর, ৮৯ : ২৭-৩০)

আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া

আমরা যদি আমাদের শারীরিক আকৃতি নির্ধারণ করতে না পেরে থাকি, আমাদের ভাগ্যও আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই স্থির করেন মানুষের জন্ম, তার সম্প্রদায়, তার পরিবার এবং জীবনব্যাপী তার লব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ কি হবে। আবার আল্লাহই আমাদের ভিতরে জ্ঞান ও বিবেকবোধের প্রেরণাদাতা।

এমনকি আল্লাহর উপর আমাদের বিশ্বাসও আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সেই একক ও একমাত্র আল্লাহই আমাদের ঈমান দান করেন। তিনিই আমাদের হিদায়াত দান করেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেন। যেমন মূসা ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন: "আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।" (সূরা তা-হা, ২০ : ৫০)

সুতরাং মু'মিনরা তারা, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য নির্বাচিত: "আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। এ ব্যাপারে কারো কোন ক্ষমতা নেই।" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৬৮)

যারা জাহান্নামী, তারা সেখানকারই যোগ্য, কারণ তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়ার অনুভূতিই তাদের যথার্থ প্রতিফল। আর যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আল্লাহ তাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেছেন এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেছেন।

মু'মিনদের উপলব্ধি করা উচিত যে আলাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া কত চমৎকার এবং সর্বান্ঃকরণে আলাহর শোকর ও প্রশংসা করা উচিত যা কিছু তিনি তাঁর অনুগ্রহে দান করেছেন সেজন্য। তাদের খুশী হওয়া উচিত যে তারা লৰ লৰ মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং তারা আলাহর সেই সমস্ রহমতপ্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক বান্দাদের একজন যাদেরকে দুর্দশার মুখোমুখি এক জনগোষ্ঠী থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মু'মিনের সমস্ আচার আচরণের মাঝে এই বিরাট মর্যাদার প্রকাশ ঘটা উচিত। যারা ৰতির সম্মুখীন, আলাহ তাদের সম্পর্কে বলছেন: "কালের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ৰতির মধ্যে, তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আল-আসর, ১০৩ : ১-৩)

মহাবিশ্বের প্রভু কর্তৃক সবার মধ্য থেকে সম্মানিত এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার চাইতে বড় মর্যাদা কি আর আছে?

দোয়া

একটি আয়াতে দোয়ার গুর্ত্ব এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "বল, আমার প্রভু আমাদের কোনই পরওয়া করেন না যদি না তোমরা তাঁকে ডাক।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৭)

দোয়া হচ্ছে আলাহর সাথে সাৰাৎ করা, বস্তুতঃ এটি হচ্ছে সে সমস্ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম গুর্ত্বপূর্ণ একটি যা মু'মিনকে অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করে। আলাহর উপর একজনের ঈমান পরিমাপের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশক হচ্ছে দোয়া।

অধিকাংশ মানুষ ভাবতে পারে যে, এই মহাবিশ্বে কোন ঐশী সত্তার নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সবকিছুই স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু তারা যা মানে না তা হচ্ছে আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে অস্িত্ববান সকল আত্মাই আলাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এমন কোন সৃষ্টি নেই যার ভাগ্য আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয় এবং যে তাঁর বাধ্য নয়। যখন তিনি কিছু করতে চান, তিনি শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়। (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১১৭)

অবিশ্বাসীরা এই প্রকৃত সত্য বুঝতে পারে না এবং তারা তাদের সারা জীবন এ কথা বোঝার চেষ্টায় ব্যয় করে যে এই মহাবিশ্ব কাল্পনিক বস্তুকণা দিয়ে তৈরি। মু'মিনরা, অপর পৰে, বিশ্বের রহস্য সম্পর্ক কুরআন থেকে শিৰালাভ করে। তারা একথা জানে যে, কোন কিছু সম্পর্কে জানতে পারার একমাত্র পথ হচ্ছে যিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, তাঁর কাছেই জানতে চাওয়া। তারা জানে যে আলাহ সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক: "আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে, বল আমি তাদের কাছেই রয়েছি। যারা আমার কাছে দোয়া করে, আমি তাদের দোয়া শ্রবণ করি। সুতরাং তারা যেন আমার আদেশ মেনে চলে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৬)

যাই হোক, একথা বুঝতে হবে যে আলাহ দোয়া শ্রবণ করেন-এর অর্থ এটা নয় যে তাঁর কাছে যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যাবে। কারণ মানুষ অজ্ঞ, এবং সে "যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ খুবই দ্রুততা প্রিয়।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১১)

সুতরাং আলাহ আমাদের সকল প্রার্থনাই শোনেন, কিন্তু কখনও আমরা যা চাই তা দেন, কখনও তা দেন না, কারণ সত্য কথা হচ্ছে যে সেটা "মন্দ"।

কিভাবে আমাদের দোয়া করা উচিত, কুরআনে তাও বলে দেওয়া হয়েছে: বিনয় সহকারে এবং গোপনে, পরিপূর্ণ আন্রিকতার সাথে, রহমতের আশা করে এবং একই সাথে আলাহর ভয় হৃদয়ে রেখে, এবং গভীর মনোযোগের সাথে:

"তোমার প্রভুর কাছে চাও বিনয়-নম্রতার সাথে, গোপনে: ...তাঁকে ডাক আশা ও ভয় সহকারে: কারণ আলাহর রহমত তাদের কাছেই রয়েছে যারা সৎকর্মশীল।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৫৫-৫৬)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সবচেয়ে উত্তম নামসমূহ আলাহরই, তাঁকে ডাক সেসব নামের দ্বারা।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮০)

আসলে, আমাদের দোয়া হচ্ছে আলাহর কাছে আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দোয়া করা থেকে বিরত থাকা আলাহর বির্দ্ধে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ প্রকাশ করে। আলাহ তাঁর কিতাবে বলছেন:

"আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব: কিন্তু যারা আমার আনুগত্যের ব্যাপারে উদ্ধত, নিশ্চয়ই তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে-সেখানে তারা হবে লাঞ্ছিত।" (সূরা আল-গাফির, ৪০ : ৬০)

আলাহকে ডাকা একই সাথে দোয়া এবং রহমত। কিছু চাওয়া বা অনুরোধ করার মত সহজ কাজটিই হচ্ছে সমস্ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক লৰ্য অর্জনের চাবিকাঠি।

তওবা করা এবং ৰমা চাওয়া

আলাহর যে দুটি নাম কুরআনে সর্বাধিকবার উলিখিত হয়েছে-তা হচ্ছে কর্ণাময় (আর-রাহমান) ও দয়ালু (আর-রহীম)। আলাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি আসলেই অত্যন্ ৰমাশীল এবং তাদের পাপের জন্য তাৎৰণিক শাস্ি দেন না।

“আলাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য জন্য শাস্তি দিতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীবিত প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরান্বিত করতে পারে না।” (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৬১)

অবকাশ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি মন্দলোকদের অনুতাপ করার এবং তওবা করার সুযোগ দেন। যত বড় পাপই কেউ করুক না কেন, সে সব সময়ই ক্ষমার সুযোগ পাবে যদি সে অনুতপ্ত হয় এবং যথাযথ আচরণ করে:

“আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এর পরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।” (সূরা আল-আনআম, ৬ : ৫)

তওবার মাঝে আলাহর কাছে সাহায্য ও শক্তি চেয়ে দোয়াও থাকে যাতে আবার কেউ সেইসব অসৎকর্মে লিপ্ত না হয়। আলাহ সেই তওবাই কবুল করেন যার পর কোন সৎকর্ম করা হয়: “যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে প্রকৃত অর্থে আলাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।” (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭১)

কখনো কেউ হয়তো তার নফসের প্ররোচনায় একই পাপ পুনরায় করতে পারে, তওবা করার পরেও। কিন্তু এটা তার আবার তওবা করার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সে তার মন্দকাজের জন্য সারাজীবন ধরেই অনুতাপ করতে পারে। এবং এটা মনে রাখতে হবে যে মৃত্যুর সময়ে, যখন মানুষ তার আখিরাতের পরিণতির কথা ভেবে কাতর হবে, তখন কোন তওবা কবুল করা হবে না।

“অবশ্যই আলাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আলাহ ক্ষমা করে দেন। আলাহ জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।” (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৭)

“আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তওবা করছি, আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।” (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৮)

আরেকটি আয়াত সব মু'মিনকে নাজাতের দিকে আহ্বান করছে: “মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আলাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩১)

আমৃত্যু ধৈর্যধারণ করা

মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই অধৈর্য, ফলে তারা নানারকম ভুল করে। আসলে, ধর্মের চাহিদা হচ্ছে প্রত্যেকেই আলাহর ওয়াস্তে ধৈর্যধারণ করবে। বিশেষভাবে মু'মিনদের উচিত সবরের সাথে আলাহর প্রতিশ্রুত নাজাতের অপেক্ষা করা। কুরআনে মু'মিনদের এই মর্মে আদেশ করা হয়েছে: “ধৈর্যধারণ কর তোমার রবের জন্য।” (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৭) আলাহর পথে জিহাদের জন্য সবর বা ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম, এটা এমন একটা গুণ যা প্রত্যেকেরই অর্জন করতে চেষ্টা করা উচিত, যাতে আলাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং দৃঢ়তা অবলম্বন কর , এরূপ অধ্যবসায়ে প্রতিযোগিতা কর, পরস্পরের হাত শক্তিশালী কর, এবং আলাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ২০০)

অজ্ঞ জনগোষ্ঠীর মাঝে, সবর এর আসল অর্থ সহিষ্ণুতার সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। আসলে সহিষ্ণুতা একটি ভিন্নতর অর্থ বহন করে, যা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার সাথে যুক্ত। যদিও কুরআনের বর্ণনানুসারে সবরের অর্থ একেবারেই আলাদা। এই পার্থক্য শুধুমাত্র মু'মিনরাই উপলব্ধি করতে পারে। মু'মিনের সকল চেষ্টা-সাধনা কেবল আলাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সেজন্য এর মাঝে মু'মিনের আনন্দ নিহিত, অপরপক্ষে 'সহিষ্ণুতা' অবিশ্বাসীদের মাঝে কেবল বিরক্তি ও দুর্ভোগই আনে। কুরআন বিষয়টা এভাবে বর্ণনা করছে:

“আলাহর সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে, অবশ্য এটি একটি কঠিন কাজ, যারা খাশিয়ীন (বিনয়ী) তাদের জন্য ব্যতীত।” (সূরা আল-বাকারা. ২ : ৪৫)

এই সূরার আরেক আয়াতে বাধা ও সংকটের মুখে সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে:

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, কিছু মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে হুকুম করে দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন যেন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আলাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।” (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৫-১৫৬)

সবর এমন একটি মহৎ গুণ, যা মু'মিনের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম। নিম্নোক্ত আয়াতে আলাহ বলছেন, কিভাবে সবর দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়:

“এখন আলাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও, তবে আলাহর ইচ্ছানুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। কারণ আলাহ রয়েছেন সবরকারীদের সাথে।” (সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৬)

সবর এমন একটি গুণ, যা কুরআনে বর্ণিত অন্যসব গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে। একজন মানুষ ভদ্র, বিনয়ী, দানশীল, অনুগত অথবা নিবেদিতপ্রাণ হতে পারে, কিন্তু এগুলো তখনই মূল্যবান হয়ে উঠবে যখন এর সাথে সবর যুক্ত হবে। এটা সেই সবর, যা সালাতের মাঝে এবং মু'মিনের গুণাবলীর মাঝে প্রকাশ পায়। তা তাদের গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

মু'মিনের সমস্ত জীবনে সবর ব্যাপ্তি লাভ করে, যারা এই হুকুম মেনে চলে:

"তোমার প্রভুর জন্য ধৈর্যধারণ কর," অবশেষে, আলাহ তাদের আত্মাকে গ্রহণ করেন এবং জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ফেরেশতারা জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে সৎকর্মশীলদের স্বাগত জানায়, এই বলে যে:

"তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আর তোমাদের এই শেষ বাসস্থান কতই না চমৎকার!" (সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৪)

আলাহর সাহায্য

ধর্মহীন সমাজে মানুষ তার চরিত্র গড়ে তোলে তার সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতে হলে তাকে খুব ধনী অথবা বিখ্যাত বা সুন্দর অথবা আকর্ষণীয় হতে হবে। সম্পূর্ণ অজ্ঞ সমাজে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য কোন 'সম্মানিত' ব্যক্তির পুত্র-কন্যা হওয়াটাও একটা উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অথচ বিশ্বাসীদের জন্য ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। কারণ বিশ্বাসীরা কোন কিছুর জন্য আলাহ ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করে না। অবিশ্বাসীরা যা অনুসরণ করে সেসব দুনিয়াবী বৈশিষ্ট্যকে তারা কোন গুরুত্ব দেয় না।

আলাহ সবসময়ই মু'মিনদের সাহায্যকারী। অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার মুখে তিনি কখনই তাদের লাঞ্ছিত করেন না। "আলাহ ঘোষণা করেছেন: ' আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী' " (সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১), সুতরাং রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা আলাহর বিপুল সাহায্যে অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আলাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন: "যদি তারা তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, আলাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে এবং মু'মিনদেরকে তাঁর সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেছেন।" (সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬২)

এটা কখনোই ভুলে গেলে চলবে না যে একমাত্র আলাহই মু'মিনদের শক্তি দেন এবং উন্নত করেন এবং তাদেরকে সফলতা দান করেন। বাহ্যিক কারণ এবং তার ফলাফলের উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়। তাতে কিছু অর্জিত হয় না, সক্রিয়ভাবে প্রার্থনায় রত হওয়া ছাড়া। মুখে সাহায্যের প্রার্থনা করা উত্তম, কারণ দোয়ার উত্তরেই আলাহ কাঙ্খিত ফল দান করেন। এজন্যই মু'মিনদের সম্পূর্ণভাবে আলাহর সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হবে।

এর ফলে মু'মিনরা এতই সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে যে, তারা বিশ্বের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে। তারা যে কোন নেতিবাচক চিন্তা অথবা কাজের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাও আর অবশিষ্ট থাকে না। মূসা (আঃ) হতাশ হননি যখন তাঁর কওম সীমালঙ্ঘন করেছিলো, তিনি বলেছিলেন: "যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তোমরা এবং সমস্ত পৃথিবী একত্রে, তবু আলাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮)

মূসা (আঃ) এরকমই আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভয় ছিলেন, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন আলাহ ও তাঁর সাহায্য সবসময়ই বিশ্বাসীদের সাথে আছে। আলাহ একবার তাঁর কাছে ওহী নাযিল করেন: "ভয় কোর না। কারণ নিশ্চয়ই তুমিই সুবিধাজনক অবস্থানে আছ।" (সূরা তা-হা, ২০ : ৬৮)

মূসার মনোভাব মু'মিনদের কাছে অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ। কারণ আলাহ সকল মু'মিনকে শুধু মূসা বা অন্যান্য রাসূলদেরকে নয়, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রক্ষা ও সাহায্য করতে এবং বিজয় দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন কুরআনে বলা আছে:

"...আলাহ কখনোই অবিশ্বাসীদের মু'মিনদের উপর বিজয়ী করবেন না।" (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৪১)

মু'মিনরা শুধুমাত্র আলাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখবে এবং তাঁর সৎ বান্দা হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবে। যখন এমন হবে, তাদের ভয় করার কিছুই থাকবে না।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধনের) চিন্তা কর, যদি তোমরা সঠিক পথ অনুসরণ কর, তাহলে পথভ্রষ্টদের কাছ থেকে তোমাদের ক্ষতির কোন কারণ নেই। তোমাদের সবাইকে আলাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন তোমরা যা কিছু করতে।" (সূরা আল মায়িদা, ৫ : ১০৫)

অবিশ্বাসীরা কখনই সৎকর্মশীলদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মু'মিনদের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রই বৃথা হয়ে যাবে। নিচের আয়াতে এই রহস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই তাদের চক্রান্ত অতি ভীষণ ছিল, কিন্তু তার সবই আলাহর দৃষ্টির সীমানায় রক্ষিত, যদিও তা পাহাড় টলিয়ে দেবার মত সামর্থ্যবান ছিল।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৬)

যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, বাস্তবে আলাহ তাদেরকে "ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে আসেন এমনভাবে, যে সম্পর্কে তারা ধারণাও করতে পারবে না।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮২) তারা মনে করে তারা বিশ্বাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সহজেই তাদের পরাজিত করতে পারবে। বস্তুতঃ আলাহ মু'মিনদের পক্ষে এবং তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব তাদের কাছে প্রকাশিত। কুরআন তাই সত্যকে তুলে ধরেছে, যা মুনাফিকদের উপলব্ধির বাইরে, এভাবে যে:

"তারা বলে: আলাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। আলাহই ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের ধনভাণ্ডারের মালিক, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে: যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। সম্মান তো আলাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"
(সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৭-৮)

এটি নিশ্চয়ই একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম। বিশ্বাসীরা নিম্নের আয়াতের অনুসারে, "ওহে মু'মিনগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর... "(সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭১), সবসময় সতর্ক থাকবে এবং অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে সচেতন হবে, কিন্তু উপরে বর্ণিত আলাহর নিয়মের অধীনে সুরক্ষা অনুভব করবে।

অন্য একটি আয়াতে আলাহ এই নিয়ম বর্ণনা করেছেন: "যারা আলাহকে প্রত্যাখ্যান করে, মানুষকে আলাহর রাস্তায় চলতে বাধা দেয় এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে হিদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর, তারা আলাহর সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দেবেন তাদের কর্মসমূহকে।" (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৩২)

মু'মিনদের জন্য কোন হতাশা নয়

দুই ধরনের হতাশা রয়েছে। প্রথম ধরনের উদ্ভব হয় সমস্যা অথবা বাধার সম্মুখীন হলে। মু'মিনের আচরণ এমন হওয়া উচিত নয়। তার সবসময় মনে রাখতে হবে যে আলাহ মু'মিনকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুরআন বলছে যে আলাহই বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাদের তাঁর সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করে থাকেন।

দ্বিতীয় ধরনের হতাশা বেশি বিপজ্জনক, যা হচ্ছে কোন ভুল বা পাপ করার পর আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। কারণ এ থেকে এমন চিন্তা মনে আসতে পারে যে আলাহ ব্যক্তি বিশেষের পাপ ক্ষমা করবেন না এবং তাকে জাহান্নামে যেতেই হবে। কিন্তু এই ধারণা–যা শুধু অনুমান মাত্র–কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। নিশ্চয়ই আলাহ তাদের পাপ ক্ষমা করেন যারা আন্তরিকভাবে তওবা করে। আলাহর রহমতের আশ্রয় চাওয়া, তা যত "দেরি"তেই হোক না কেন, কখনো ব্যর্থ হয় না। আলাহ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলছেন:

"হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করেছ! আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না: কারণ আলাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, পরাম দয়ালু।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯-৫৩)

হতাশা হচ্ছে শয়তানের প্রলোভন। শয়তান চেষ্টা করে মু'মিনদের নৈতিকভাবে দুর্বল করে তাদের দিয়ে আরো গুরুতর ভুল করাতে। তার লক্ষ্য হচ্ছে মু'মিনদের নিজেদের ঈমান ও আন্তরিকতার উপর সন্দেহের সৃষ্টি করা, যাতে তারা সেগুলিকে 'কৃত্রিম' ভেবে বিভ্রান্ত হয়। কেউ যদি এই ফাঁদে পড়ে, সে তার আত্মসম্মানবোধ হারাবে এবং পরিণতিতে ঈমান থেকে বিচ্যুত হবে, এবং প্রথম ভুলটি করার পর আরো বড় বড় পাপ কাজে অগ্রসর হবে। এরকম মানসিক অবস্থায়, বিশ্বাসীরা আলাহর কাছে অবিলম্বে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, কুরআনের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটাবে। এরকম পরিস্থিতিতে মু'মিনের করণীয় সম্পর্কে কুরআন বলছে:

"যদি তোমাদের মনে শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা আসে, তাহলে আলাহর কাছে আশ্রয় চাও। বস্তুতঃ তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ২০০)

যদি মানুষ আন্তরিকভাবে আলাহর উপর ঈমান রাখে, তবে আলাহ তাকে তার ভুল বা পাপ সত্ত্বেও ক্ষমা করেন। অধিকন্তু, যদি সে দীর্ঘসময় পর্যন্ত অবিশ্বস্ত থাকে, তবুও তার জন্য তওবার দরজা খোলা রয়েছে। তাকে হতাশায় নিমজ্জিত করা শয়তানের একটি চাল মাত্র। কারণ অনন্ত ক্ষমা ও সুবিচার করতে পারেন একমাত্র আলাহই, এবং তিনিই বিজয় ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের। ইয়াকুবের (আঃ) উপদেশ এক্ষেত্রে সকল মু'মিনের পথ নির্দেশক হওয়া উচিত।

"... আলাহর রহমতের আশা কখনো ছেড়ে দিও না। নিশ্চয় আলাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭)

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুর মূল্যায়ন করা

মু'মিনের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আলাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া। মানুষকে তাদের অসার বাসনা ও লোভ পূরণের জন্য, অথবা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে আলাহর দাসত্ব করা।

এই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআনকে একক দিক নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করা। আমাদের উচিত সম্পূর্ণভাবে কুরআনের প্রতিটি হুকুম পালনে মনোনিবেশ করা। কুরআনের প্রতিটি হুকুম যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কুরআন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মু'মিনদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্ট হুকুম-আহকাম-সম্বলিত আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমন সেসব আয়াত যেগুলোতে নিয়মিত সালাত আদায়, সিয়াম অথবা হজ্জ এসবের কথা আছে, বরং সেসব আয়াতের উপরও যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াতে মু'মিনদের বলা হয়েছে – "ডাক তোমাদের প্রভুর পথে হেকমতের সাথে এবং উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর পছন্দনীয় পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫)

মু'মিনরা এই "হেকমতের সাথে ও উত্তমরূপে" আহবান করার বিষয়টি বুঝতে পারে কুরআনের সাধারণ যুক্তি ও রীতির মাধ্যমে, এবং তাদের নিজেদের জ্ঞান ও বোধশক্তির সাহায্যে।

আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে যাতে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। যেমন, কুরআনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত আছে এবং কিভাবে আমরা এই বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে আচরণ করব তাও বলা আছে। এবং কিভাবে এরকম মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাও কুরআনের সেইসব আয়াতে বলে দেওয়া আছে, যাদের শুরু হচ্ছে "বল" দিয়ে।

যে সব আয়াতে মু'মিনদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারা কেমন আচরণ করবে, তা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে গেলে, এদের সত্যিকার তাৎপর্য সাথে সাথে বুঝে নিতে হবে। এখানেই মু'মিনের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগতে পারে।

কুরআনে বিভিন্ন ধরনের লোকেদের বর্ণনা আছে, যেমন, মু'মিন, খৃষ্টান, ইহুদী, মুনাফিক এবং প্রকৃতি উপাসক। আমাদের অবশ্যই আনুষঙ্গিক আয়াতগুলি খুব ভালভাবে জানতে হবে, কারণ এসব লোকদের সমাজে চিহ্নিত করে তাদের সাথে কুরআনের হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করা প্রয়োজন। "জীবন্ত কুরআন" হওয়ার জন্য এটা অপরিহার্য। তা ছাড়াও মু'মিনদের বুঝতে হবে যে আমাদের চারপাশের মানুষেরা নিঃসন্দেহে কুরআনে বর্ণিত কোন না কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত মানুষ, যারা সমাজ গঠন করেছে, কুরআনে বর্ণিত আছে এবং কাউকেই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি – "আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার কিছুই খেলাচ্ছলে তৈরি করা হয়নি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১৬)

সে যাই হোক, কুরআনে শুধুমাত্র আমাদের চারপাশের লোকদের কথাই বর্ণিত হয়নি। আসলে যা কিছু আমরা দেখি এবং যা কিছু ঘটে, তার সবই কুরআনের বর্ণনার প্রতিফলন মাত্র।

"শীগগিরই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে এটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫৩)

সারা বিশ্ব আলাহর নিদর্শনে পূর্ণ। যেভাবে একটি চিত্র তার চিত্রকরকে দর্শকের সামনে তুলে ধরে, যেভাবে চিত্রের প্রতিটি কারুকার্য চিত্রকরের 'তুলির আঁচড়'কে প্রকাশ করে, সেভাবে সমগ্র বিশ্ব ও তার প্রতিটি অংশ আলাহর পরিচিতি তুলে ধরার জন্যই অস্তিত্বশীল, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা। একথাটি মু'মিনরা যত ভালভাবে বুঝবে, তত বেশি গভীরভাবে তারা আলাহকে চিনবে এবং কষ্ট সহ্য করে হলেও তাঁর আনুগত্য করবে। যখন কেউ বুঝতে পারে যে, জীবন তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সহ কুরআনে সংজ্ঞায়িত একটি নিদর্শন মাত্র, সে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি জিনিসকেই কুরআনের মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত করবে।

আলাহর নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সবকিছু ঘটছে, সুতরাং সবকিছুর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যা মু'মিনের করা উচিত তা হচ্ছে প্রতিটি ঘটনাকে কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করা এবং কুরআন যেভাবে বলেছে সেভাবে কাজ করা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেউ যখন কোন অর্থহীন ও অলস কোন কিছুর সম্মুখীন হয়, মু'মিনের উচিত নয় সেদিকে কর্ণপাত করা। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে এই অর্থহীন কাজকর্মও সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মু'মিনরা এতে জড়িত না হয়। প্রত্যেক ঘটনাই মু'মিনের উচিত কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা। সুতরাং তারা তাদের সংস্কৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলবে, যেভাবে আলাহ হুকুম করেছেন। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য, অজ্ঞ-অতীত এবং সমাজের কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তা বর্জন করতে হবে। কুরআনের যুক্তি ও ব্যাখ্যা অনুসারে তাদেরকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ আলাহর বাণী প্রতিটি পরিস্থিতির পথ নির্দেশক। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, এই কিতাব আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে "সবকিছু ব্যাখ্যা করে" (সূরা আন-নাহল, ১৬-৮৮)।

আলাহ সব হৃদয়ের রহস্য জানেন

অবিশ্বাসীদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের কপটতা। তারা আলাহর প্রতি অনান্তরিক, অন্য লোকের প্রতি এমনকি নিজেদের প্রতিও। যদিও প্রয়োজনের খাতিরে লোকের সাথে তারা উষ্ণ ব্যবহারও করতে পারে, একই সময়ে তারা খুব সহজে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা হিংসা পোষণ করতে পারে। সত্যি বলতে কি তাদের কপটতা তাদের নিজেদের প্রতিও। যদিও তারা তাদের কাজের ভুল এবং মন্দ পরিণতি স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, বাস্তবতাকে অবচেতন মনের গভীরে ঠেলে দিয়ে তারা এমনভাবে কাজ করে যায়, যেন তারা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন এবং সঠিক।

এই কপটতা বা অনান্তরিকতার মূলে যে ধারণা কাজ করে তা হচ্ছে এই যে, তাদের অন্তরের গোপন চিন্তা আর কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং, দোষী ব্যক্তি এমন ভাব করে যেন সে তা নয়, তাদের পাপ ও মন্দকাজ সত্ত্বেও। আসলে, একটি অজ্ঞ সমাজে, মানুষ সত্যিই অন্যের প্রকৃত চিন্তা কি তা জানে না, এবং তারা কখনো ভেবে দেখে না যে আলাহ সব অন্তরের সকল চিন্তা ও রহস্য জানেন। অবচেতন মনের চিন্তাসমূহও এর মাঝে আছে, যদিও ব্যক্তিমানুষ নিজেই জানেনা সেখানে কি আছে। আলাহ এ কথা নিম্নের আয়াতসমূহে বলছেন:

"তিনি জানেন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কি আছে, এবং তিনি জানেন তোমরা কি গোপন কর আর কি প্রকাশ কর: এবং আলাহ অন্তরের গোপন রহস্য সম্যক অবহিত।" (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ৪)

"তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহ বোঝেন, (তিনি) সুপরিজ্ঞাত।" (সূরা আল-মুলক, ১৩-১৪)

কেউই, সেজন্য, আলাহর জ্ঞানের বাইরে কোন কথা বলতে পারে না, কারণ অন্তরের গোপন বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। কুরআনে, এই সত্য এভাবে বলা হয়েছে:

"তোমরা কি দেখ না আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আলাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত না থাকেন, পাঁচজনের মধ্যেও হয় না যেখানে ষষ্ঠজন হিসাবে না থাকেন, সংখ্যায় তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন আলাহ তাদের সঙ্গে আছেন। তারা যা করে তিনি তাদের কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আলাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।" (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭)

এজন্য কোন কিছুই আলাহর কাছ থেকে লুকানো সম্ভব নয়। আলাহ শুধু সকলের সব কাজ সম্পর্কেই যে জানেন তা নয়, তাদের চিন্তাধারাও জানেন, অবচেতন মনে যা আছে তা সহ-যার অধিকাংশই তারা জানে না। নিম্নের আয়াতে এ ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া হয়েছে:

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, এবং তার অন্তরের নিভৃত কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" (সূরা কাফ, ৫০ : ১৬)

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে, আলাহর সম্মুখে একজন মু'মিনের প্রত্যাশিত আচরণ হবে আন্তরিকতাপূর্ণ ও বিনয়নম্র। যেহেতু আলাহই স্রষ্টা এবং সকলের সবকিছু জানেন, তাঁর সম্মুখে কৃত্রিম আচরণ করা অর্থহীন। প্রত্যেকের উচিত নিজের বিশ্বাসের দুর্বলতা, ত্রুটি, মন্দকাজ এবং দোষ আলাহর কাছে প্রকাশ করা এবং তাঁর দয়া ও সাহায্য চাওয়া।

নবীগণ হচ্ছেন আলাহর প্রতি তাঁদের আন্তরিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। নবী ইবরাহিম আলাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এবং বলেছিলেন "আমাকে দেখাও, হে আমার রব, কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।" এবং তখন আলাহ উত্তরে বলেছিলেন: "তুমি কি বিশ্বাস করো না?" তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, শুধু আমার অন্তরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য।" (সূরা আল বাকারা, ২ : ২৬০) এভাবেই মু'মিনরা তাদের দুর্বলতা আলাহর কাছে স্বীকার করে এবং শুধু তাঁর কাছেই ক্ষমা চায়। অনুরূপভাবে যখন আলাহ নবী মূসাকে আদেশ করলেন: "ফেরাউনের কাছে যাও" তিনি বললেন, "হে আমার রব! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, এবং আমি ভয় করি, তারা আমাকে হত্যার চেষ্টা করবে।" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৩৩) এবং সাহায্য ও শক্তি চাইলেন আলাহর কাছে। আলাহর সম্মুখে নবীদের এই সততা শিক্ষা দেয় মু'মিনদের আচরণ কি হওয়া উচিত।

কেউ যদি বুঝতে না পারে যে সে দুর্বল এবং আলাহর উপর নির্ভরশীল, সে কখনো শক্তি, নম্রতা, ঈমান এবং সাহসের মত গুণাবলী অর্জন করতে পারে না, এগুলো তার ভিতরে আছে এই ভান করে মাত্র, কারণ "...মানুষকে দুর্বল হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে," (সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৮) যাতে সে আলাহর সম্মুখে তার দীনতা বুঝতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত আলাহর প্রতি অত্যন্ত সৎ ও নিবেদিত প্রাণ হওয়া,তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আগে নিজের দোষ ও পাপ স্বীকার করা।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন

মানুষকে খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে সে পরীক্ষিত হবে, প্রশিক্ষিত হবে এবং তারপর আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে, সেখানে সে চিরকাল বাস করবে। দুনিয়ার সম্পদ এবং নিয়ামতসমূহ, যদিও তা জান্নাতের সম্পদ ও নিয়ামতসমূহের অনুরূপ, তাদের ভিতরে বহু ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে। কারণ এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

যেভাবেই হোক, এ সত্য অবিশ্বাসীরা উপলব্ধি করে না, তাই তারা এমন আচরণ করে যেন এই পৃথিবীর বস্তুসামগ্রীই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যদিও, এটা সম্পূর্ণই প্রতারণামূলক, কারণ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এবং ত্রুটিপূর্ণ নিয়ামতরাজি মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না-যে মানুষকে ঐশী পরিপূর্ণতার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আলাহ বলছেন কিভাবে এই দুনিয়া একটি প্রতারণায় পরিপূর্ণ অস্থায়ী আবাস রূপে সৃষ্টি হয়েছে:

"জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শাঘা ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য সম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে দুনিয়ায় মশগুল রয়েছে, তার জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আলাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০)

ঠিক যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, সমস্ত অজ্ঞ মানুষ জীবন ধারণ করে শুধু কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে, যেমন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারস্পরিক গর্ব ইত্যাদি। আরেকটি আয়াতে দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং প্রতারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"নারী, সন্তান, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আলাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বল, আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনী এবং আলাহর সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ আলাহ তাঁর দাসদের দ্রষ্টা।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪-১৫)

ইহজীবন একেবারেই আদিম বা প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় মূল্যহীন। এ ব্যাপারটা প্রকাশ করার জন্য মূল আরবীতে যে শব্দটি 'বিশ্বের' জন্য ব্যবহার করা হয়, তার অর্থ হচ্ছে একটি "চটচটে, জনবহুল, নোংরা জায়গা"। মানুষ আশা করে যে পৃথিবীতে তাদের ৬০-৭০ বৎসরব্যাপী জীবন হবে দীর্ঘ এবং সুখকর। তবুও, মৃত্যু অত্যন্ত দ্রুত আগমন করে এবং সকলেই কবরে চলে যায়।

সত্যি বলতে কি, মৃত্যু যত নিকটবর্তী হতে থাকে, একজন বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে কত স্বল্প সময়ই না সে অবস্থান করেছে। পুনর‍ুত্থান দিবসে, আলাহ্ মানুষকে প্রশ্ন করবেন:

“তিনি বলবেন: ‘তোমরা পৃথিবীতে ক’বছর অবস্থান করেছিলে?’ তারা বলবে, ‘আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কোন অংশ, আপনি না হয় হিসাব রৰককে জিজ্ঞাসা কর‍ুন!’ তিনি বলবেন, ‘তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?’” (সূরা আল-মু’মিনুন, ২৩ : ১১২-১১৫)

আলাহকে অস্বীকার করা এবং আখিরাতকে উপেৰা করা‍সারা জীবনব্যাপী দুনিয়ার লোভে মত্ত থেকে ‍ অন‍ন্ত শাস্তি এবং জাহান্নামের আগুনে জ্বলার কারণ হবে। যারা এভাবে জীবন যাপন করে তাদেরকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এমন মানুষ হিসাবে যারা “আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে ক্রয় করে।” তাদের জন্য আলাহর হুকুম হচ্ছে: “তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না, না তাদের কোন সাহায্য করা হবে।” (সূরা আল-বাকারা, ২ : ৮৬)

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

“যারা আমার সাৰাতের ভয় করে না ও পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও তাতেই নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবহিত, তাদের কৃতকর্মের জন্য আগুনই হচ্ছে তাদের আবাস।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ৭-৮)

যারা ভুলে যায় যে পৃথিবী একটি ৰণস্থায়ী পরীৰার স্থান মাত্র এবং যারা আলাহর সতর্কবাণী সম্পর্কে উদাসীন, কিন্তু শুধু পার্থিব খেলাধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তি নিয়ে তৃপ্ত, যেগুলি তারা নিজস্ব বলে মনে করে, এমনকি আকর্ষণ বোধ করে‍তারা অবশ্যই লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের সম্মুখীন হবে। কুরআন এ ধরনের লোকের অবস্থান সম্পর্কে বলছে:

“তখন যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে, জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থল।” (সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ৩৭-৩৯)

সব সম্পদের প্রকৃত মালিক

অধিকাংশ ৰেত্রেই সম্পদের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ মানুষকে দুঃখ এবং কষ্টের সম্মুখীন করে। আসলে অবিশ্বাসীদের সমস্ত জীবন “সম্পদ প্রাপ্তির” লোভের উপর ভিত্তি করে গঠিত। তারা সবসময় আরো বেশি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে, এটাকেই তারা তাদের জীবনের প্রকৃত লৰ্য বানিয়ে নেয়।

সে যাই হোক, “সম্পদ ও সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা” (সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ২০) একটি সার্বিক প্রতারণা, কারণ পৃথিবীর সব সম্পদের মালিকানা আলাহর। মানুষ নিজেকে কোন কিছুর মালিক মনে করে শুধু নিজেকেই বোকা বানায়, কারণ তারা নিজেদের অধিকারভুক্ত কোন বস্তুকে তৈরীও করেনি বা সেগুলিকে জীবিত ও চিরস্থায়ী রাখার কোন ৰমতাও ধারণ করে না। না তারা তাদের নিজেদের ধ্বংস এড়াতে পারে। এছাড়াও, কোন কিছুর ‘অধিকারী’ হওয়ার মত অবস্থান তাদের নেই, কারণ তারা নিজেরাই অন্য এক সত্তার ‘অধিকারভুক্ত’। এই মহান সত্তাই ‘মানবজাতির মালিক’ (সূরা আন-নাস, ১১৪ : ২), যিনি আলাহ্। কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বই আলাহর মালিকানাভুক্ত: “যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং ভূ-গর্ভে, সব তাঁরই।” (সূরা তা-হা, ২০ : ৬) আরেকটি আয়াতে আলাহর অধিকার সম্প্রসারিত করা হয়েছে, ৰমা অথবা শাস্তি দেওয়ার ৰমতা: “তুমি কি জান না যে আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল-াহরই, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ৰমা করেন এবং আলাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।” (সূরা মায়েদা, ৫ : ৪০)

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আলাহ্ পৃথিবীতে সব কিছুই মানুষকে ৰণস্থায়ী ‘আমানত’ হিসাবে দান করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই আমানত কার্যকরী থাকবে এবং যখন বিচার-দিবস আসবে, প্রত্যেককে তার কাজের জবাবদিহি করতে হবে। বিচার-দিবসে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে প্রদত্ত আমানত সে কোন লৰ্যে এবং কোন নিয়তে ব্যবহার করেছে। যারা নিজেদেরকে মালিক হিসাবে বিবেচনা করত, সংরৰক হিসাবে নয়, এবং নবীদের বির‍ুদ্ধে এ কথা বলে বিদ্রোহ করেছিল যে, “তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে যা খুশী করতে পারব না?” (সূরা হুদ, ১১ : ৮৭), তারা প্রচণ্ড শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন বলছে: “এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আলাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে মঙ্গল আছে। বরং এ কৃপণতা তাদের জন্য অমঙ্গলকর। তারা এভাবে যে সম্পদ জমা করে রাখে, কিয়ামতের দিন সেটিই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল-াহরই, আর তোমরা যা কর আলাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৮০)

কুরআনে যেভাবে বলা আছে, আলাহ্ নিজ অনুগ্রহে বান্দাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা “কৃপণের মত জমা” না রেখে খরচ করা উচিত। তাই সম্পদ আহরণ ও সংরৰণের চেষ্টা না করে আলাহর হুকুম অনুযায়ী তা ব্যয় করা উচিত। এর অর্থ হচ্ছে মু’মিন তার জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের পরে সেটাই ব্যয় করবে যা “তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত” (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২১৯)। যদি সে যথাযথভাবে কাজ না করে এবং তার সম্পদ “রেখে” দিতে চেষ্টা করে, তাহলে এটাই বোঝা যায় যে সে নিজেকে এর “মালিক” মনে করে। যদিও এ ধরনের আচরণের শাস্তি অত্যন্ত গুর‍ুতর। কুরআনে এ কথা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"...এবং যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আলাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। সেই দিন, সেগুলি জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বে, পিঠে দাগ দেওয়া হবে, এবং তাদের বলা হবে 'এগুলি তোমাদের জমা করা সম্পদ, তাহলে তোমরা এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর।'" (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৪-৩৫)

ইসলামে "অর্থনীতি" আছে, কিন্তু "সম্পদের মজুতদারী" নেই। "খারাপ দিনের" জন্য সম্পদ জমা করে রাখায় মু'মিনরা বিশ্বাসী নয়, তারা শুধু আলাহর উপর নির্ভরশীল। প্রতিদানে আলাহ তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারা আলাহর পথে যতটা ব্যয় করে, আলাহ তাদেরকে তার চেয়েও বেশি দেন, এবং তাদের উপর তাঁর রহমত বাড়িয়ে দেন। নিম্নের আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে:

"যারা তাদের সম্পদ আলাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আলাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বর্ধিত করেন, আলাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৬১)

অপরপৰে, যে আলাহর পথে ব্যয় করে না তার অবস্থা হচ্ছে এমন একজনের মত যে "যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে, কখনও না, সে অবশ্যই নিৰিপ্ত হবে হুতামায়, হুতামা কি, তা কি তুমি জান? এ আলাহর প্রজ্বলিত হুতাশন (জ্বলন্ত আগুন)।" (সূরা আল-হুমাযাহ, ১০৪ : ২-৬)

আলাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

আলাহ সবকিছু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তাঁর অনুগ্রহসমূহের মতোই। এসমস্ত অনুগ্রহের প্রত্যেকটিই-আমাদের জীবন, বিশ্বাস, জীবিকা, স্বাস্থ্য, চোখ এবং কান মানবজাতির প্রতি আলাহর দান, যে জন্য আলাহর প্রতি মানবজাতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যখনই আমরা আমাদের গাফিলতি ও অজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে যুক্তির সাহায্যে চিন্তা করতে এবং দেখতে শুরু করব, আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করতে সৰম হবো যে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবই আমাদের স্রষ্টা আলাহর অনুগ্রহ। যা কিছু আমরা খাই, যে বাতাসে আমরা শ্বাস নেই, আমাদের চারপাশের সব সৌন্দর্য, বিশেষভাবে চোখ, যা দিয়ে সবকিছু আমরা দেখি-সবই আলাহর রহমত। তা এত বেশি যে কুরআন বলছে: "যদি তোমরা আলাহর অনুগ্রহ গণনা করতে যাও, তোমরা কখনো তা গুণতে পারবে না, কারণ আলাহ অত্যন্ত ৰমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮)

এবং নিঃসন্দেহে, এসব অনুগ্রহ বিশেষ কারণে দান করা হয়েছে। আমরা যেভাবে খুশী ব্যবহার করব, এজন্য কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এসব অনুগ্রহের কারণ হচ্ছে, যে কোন ৰেত্রে, মানবজাতিকে আলাহর সম্পর্কে শিৰা দেওয়া, কারণ প্রতিটি দানের জন্যই প্রতিদানে কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। আলাহই সবসময় আমাদের সবরকম অনুগ্রহ করে যাচ্ছেন। আমাদের সেজন্য উচিত আন্তরিকভাবে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো।

কৃতজ্ঞ হওয়া বা শোকর করা একইসাথে একটি উত্তম দোয়া এবং আমাদেরকে "সীমালঙ্ঘনের" হাত থেকে বাঁচানোর একটি উপায়। শোকর না করলে মানুষের পৰে নৈতিক বিচ্যুতি এবং মন্দের প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা থাকে। তারা নিজেদের দুর্বলতা ভুলে গিয়ে উদ্ধত হয়ে ওঠে, এবং আরো ধনী ও শক্তিশালী হতে থাকে। আলাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে এ ধরনের "নৈতিক বিচ্যুতি" থেকে রৰা করে। যারা আলাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তারা তা এজন্য করে যে যা কিছু তারা অর্জন করেছে, তার সবই আলাহর দান এবং আমরা সবাই আলাহরই। তারা জানে যে এসব অনুগ্রহ আলাহর প্রদর্শিত পথে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করার জন্য তারা দায়িত্বশীল। নবীদের বিনয় নম্রতা এবং পরিপক্বতার ভিত্তি হচ্ছে এই কৃতজ্ঞতা, যেমন দাউদ (আঃ) অথবা সুলাইমান (আঃ), যাঁদেরকে প্রচুর সম্পদ, রাজত্ব ও ৰমতা দান করা হয়েছিল। কারূনের আসল সমস্যা ছিল আলাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, তার ধনসম্পদের কারণেই সে নৈতিকতা থেকে স্খলিত হয়েছিল।

যদি কোন মু'মিন আলাহ প্রদত্ত ধনসম্পদ ও অনুগ্রহের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেখায় যে সে উদ্ধত ও পৰপাতদুষ্ট নয়, আলাহ তাকে আরো বেশি দান করবেন। "... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ থাক, আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেব, কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা দেখাও, নিশ্চয়ই আমার আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।" (সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৭)

কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণে সীমিত থাকা উচিত নয়, আলাহ প্রদত্ত প্রতিটি অনুগ্রহ আলাহর অনুমোদিত পথে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা উচিত। মু'মিনরা তাদেরকে প্রদত্ত সবকিছুই আলাহর পথে ব্যবহারের জন্য দায়ী। প্রথমেই, সব মু'মিনের উচিত তার যা কিছু আছে তা দিয়েই আলাহর পথে সংগ্রাম করা, এবং সবচেয়ে আগে আলাহ যে শরীর তাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে শুরু করা। কুরআন বলছে, আমরা আলাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তাঁর সব অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়ে অথবা তাঁর 'বাণী' সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে:

"বস্তুত! তোমার প্রতিপালক তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমাকে পান পথহারা তারপর পথ নির্দেশ করেন, তিনি তোমাকে পান নিঃস্ব অবস্থায় অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। সুতরাং পিতৃহীনের সাথে রূঢ় হয়ো না। এবং সাহায্য প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না, এবং তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।" (সূরা দোহা, ৯৩ : ৫-১১)

আমাদের সার্বৰণিক পরীৰা

আমরা শুর–তে যা বলেছিলাম, পৃথিবীতে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি হয়নি, বরং এতে রয়েছে বিজ্ঞতা। এই সত্য বুঝতে পারাটা মানুষের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল। যার ঈমান দৃঢ় হয় এবং পরিণতিতে যার জ্ঞান ও বিচৰণতা বাড়ে, সময়ের সাথে এই যুক্তি বোঝার ৰমতাও তার আরো বাড়ে।

আমাদের ধর্মের সবচেয়ে গুর–ত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের সারাজীবনব্যাপী পরীৰিত হচ্ছি। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আলাহ আমাদের আন–রিকতা ও ঈমান পরীৰা করেন। তিনি আমাদের নানারকম অনুগ্রহ করে থাকেন, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি কিনা তা দেখার জন্য। তিনি আমাদের জন্য নানা সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন, আমরা সবর অবলম্বন করি কিনা তা দেখার জন্য: "প্রতিটি আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি তোমাদের পরীৰা করে থাকি ভাল ও মন্দ দ্বারা। আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৩৫)

বিভিন্নভাবে আমাদের পরীৰা করা হবে। কুরআনে এ কথাটা নিচের আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পরীৰা করব ভয় ও ৰুধা দ্বারা এবং ধনমাল ও কিছু ফল-ফসলের ৰতি দ্বারা, কিন্তু তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা ধৈর্যশীল।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৫)

আমাদের কিভাবে পরীৰা করা হবে সেই রহস্য দিয়েই আমাদের জীবনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথমেই আমরা আমাদের শারীরিক অস্–িত্বের মাঝে পরীৰিত হই। কুরআন বলছে, "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীৰা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।" (সূরা আল-ইনসান, ৭৬ : ২), ফলে আমরা যা শুনি ও যা দেখি তার সবই পরীৰার অংশ। সব অবস্থায় দেখা হবে আমরা কুরআনের নীতি অনুযায়ী আচরণ করি, না কি আমাদের অসার বাসনার অনুসরণ করি।

বিভিন্ন সংকটে ফেলে আলাহ মু'মিনের দৃঢ়তার পরীৰা করেন। এর মধ্যে গুর–ত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে অবিশ্বাসীদের দ্বারা মু'মিনদের উপর জুলুম। এই সমস্– অসৎকর্ম, যেমন মৌখিক আক্রমণ, ব্যঙ্গ, শারীরিক অত্যাচার এবং নির্যাতন ও হত্যার প্রচেষ্টাও মু'মিনদের জন্য পরীৰা। একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয় তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীৰা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদীদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, তবে তা হবে কর্মে দৃঢ়সংকল্প।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৮৬)

যা বোঝা সবচেয়ে বেশি গুর–ত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে এ সমস্– বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য আলাহ সৃষ্টি করেছেন বিশেষ পরীৰার জন্য। যে এ ব্যাপারটি বুঝবে না সে অত্যন্– হালকা চরিত্রের অধিকারী। কুরআন কিছুসংখ্যক ইহুদীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি দৃষ্টান্– উদ্ধৃত করেছে:

"তাদের সাগর-সৈকতে অবস্থিত জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত। যখন উক্ত শনিবারেই তাদের কাছে পানির উপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ভিন্ন অন্যদিন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল বলেই আমি এভাবে তাদের পরীৰা নিই।" (সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬৩)

যার জ্ঞান আছে, একমাত্র সেই বুঝবে যে তাকে পরীৰা করা হচ্ছে এবং এই জ্ঞানকে ব্যবহার করেই সে পরীৰায় উত্তীর্ণ হবে। সেজন্য কোন মু'মিনের ভোলা উচিত নয় যে সে তার সারা জীবন ধরেই পরীৰিত হচ্ছে। "আমি ঈমান এনেছি" শুধু একথা বললেই এসব পরীৰায় সফল হওয়া যাবে না অথবা জান্নাত লাভ করা যাবে না।

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বললে তাদের পরীৰা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আলাহ এদের পূর্ববর্তীদেরও পরীৰা করেছিলেন, আলাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২-৩)

এবং আরেকটি আয়াতে আলাহ বলেন:

"তোমরা কি ভেবেছ তোমাদের মধ্যে কে আলাহর রাস্–ায় জিহাদ করেছে এবং কে সবর করেছে তা পরীৰা করা ছাড়াই তোমরা জান্নাতে যাবে?" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪২)

আলাহ কারো উপর তার সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপান না

সমাজের একটি উলেখযোগ্য অংশই দাবী করে যে তাদের পৰে ধর্ম অনুশীলন করা কঠিন, এবং এটাই ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করার পিছনে একমাত্র কারণ। এভাবে তারা তাদের অপরাধ হালকা করতে চায়। কিন্তু তারা শুধু নিজেদেরই এভাবে প্রতারণা করে থাকে।

আলাহ কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। কুরআন যেমন বলছে: "আলাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। ভাল এবং মন্দ সে যা উপার্জন করবে সে তারই প্রতিদান পাবে।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৮৬)

আরেকটি আয়াতে এ কথার নিশ্চয়তা রয়েছে যে, আমাদের জন্য আলাহ যে দ্বীন বাছাই করেছেন, তা ইবরাহিম এর দ্বীনের মতই সহজ।

"আলাহর পথে সংগ্রাম কর যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন কঠিন বিধান দেননি, এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইবরাহিম এর দ্বীন। আলাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এ গ্রন্থেও করেছেন, যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাৰীস্বরূপ হয় এবং তোমরা মানবজাতির জন্য সাৰীস্বরূপ হও। সুতরাং তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং

আলাহকে অবলম্বন কর, তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮)

এই যখন ব্যাপার, তখন কারো জন্য এটা নির্ভেজাল প্রতারণামূলক এই দাবী করা যে, দ্বীন অনুশীলন করা কঠিন এবং এই যুক্তি পেশ করা একান্তই দোষের। এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে সে শুধু নিজেকেই প্রতারিত করে, অন্য কাউকে নয়।

অবিশ্বাসীদের প্রতি কোন ভালবাসা নয়

কুরআনের নীতি অনুসারে জীবন যাপন করতে হলে একজনকে ধর্মহীন সমাজের সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। যেসবকে পরিত্যাগ করতে হবে তার প্রথমেই রয়েছে এরকম সমাজের ভালবাসার ধারণা।

ধর্মহীন সমাজে সব সম্পর্ক এবং ভালবাসা স্বার্থপরতার উপর নির্ভরশীল। একজন আরেকজনের সাথে ভাল সম্পর্ক তখনই রাখে যখন সেখানে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অথবা অন্যজন যদি তার জন্য কিছু করে থাকে বা অন্ততঃ তার সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকে। আরেকটি পরিমাপক হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। মানুষ অন্যকে ভালবাসে শুধুমাত্র এজন্য যে তারা একই পরিবারভুক্ত, অথবা একই বংশের, বা একই সমাজের, বা কখনও এমনকি একই জাতির।

যাহোক, এগুলি মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ মু'মিনরা অন্য কিছু বা অন্য কারো চেয়ে আলাহকে বেশি ভালবাসে।

"আর কোন কোন লোক আছে যারা আলাহ ভিন্ন অন্যান্যকে আলাহর সমকক্ষ মনে করে এবং তাদেরকে আলাহর মত ভালবাসে, কিন্তু যারা আলাহর প্রতি ঈমান এনেছে তারা আলাহর ভালবাসায় সুদৃঢ়।" (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৫)

মু'মিনরা, সবকিছুর উপর আলাহকে সম্মান দেখিয়ে, তাদেরকে ভালবাসে যারা আলাহকে ভালবাসে এবং তাদেরকে অপছন্দ করে যারা আলাহর আনুগত্য করে না। যারা তাদের কাছে পছন্দনীয় অথবা পছন্দনীয় নয়, তারা তাদের আপনজন হোক বা না হোক সেটা কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এই বিষয়টি কুরআনে বিস্তারিত বলা হয়েছে:

"তুমি আলাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা ভালবাসে আলাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকে-হোক না এ বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আলাহ সুদৃঢ় করেছেন বিশ্বাস এবং অদৃশ্যশক্তি দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আলাহ এদের প্রতি প্রসন্ন এবং এরাও আলাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আলাহর দল, জেনে রাখ, আলাহর দলই সফলকাম হবে।" (সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ২২)

অবিশ্বাসীদের জন্য সামান্য ভালবাসা রাখাও একজন মু'মিনের পক্ষে সঠিক মনোভাব নয়। কুরআনে এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে বিশ্বাসীদের সতর্ক করা হয়েছে:

"হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ যদিও তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে, এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আলাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১)

নবী ইবরাহিম (আঃ) ও তার অনুসারীদের আচরণ এ ব্যাপারে মু'মিনদের জন্য চমৎকার উদাহরণ:

"তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আলাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আলাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৪)

কোন কিছুকে আলাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে প্রিয় মনে না করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা

মু'মিনের একমাত্র বাধ্যবাধকতা হচ্ছে আলাহর দাসত্ব করা। তাঁর বান্দা হওয়াই আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং আলাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করা, যার ফলাফল জাহান্নাম।

অন্য কথায়, জীবন মু'মিনের জন্য একটি হাতিয়ার মাত্র। তার উচিত প্রতিটি মুহূর্তকে আলাহর নৈকট্য লাভের এবং তাঁর পথে কাজ করার উপায় মনে করা। যদি এই হাতিয়ার তার নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়-যা অবশ্যই অবিশ্বাসীদের বেলায় সত্য-সে শীঘ্রই নিজেকে মহাসংকটে দেখতে পাবে।

মু'মিনরা কেবল একটি কারণেই বেঁচে থাকে, তা হচ্ছে আলাহ দাসত্ব করা এবং সেজন্য তারা দুনিয়াকে ত্যাগ করে। আলাহ বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"আলাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আলাহর পথে জিহাদ করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) হত্যা করে অথবা নিহত হয়। বস্তুতঃ তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ প্রতিশ্র“তিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আলাহ অপেৰা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ তার জন্য আনন্দ কর এবং এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১)

মু'মিনরা তাদের জীবন ও সম্পদ আলাহর কাছে বিক্রয় করেছে এবং নিজেদের জন্য কিছুই রাখেনি। তাদের সমস্ত জীবন পরিচালিত হয় আলাহর হুকুম অনুযায়ী। যদি আলাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেন, তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, এবং যখন তিনি তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেন, তারা এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে না, যদিও তারা জানে যে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ ধরনের মু'মিনরা যে কোন আত্মত্যাগে পিছপা হয় না এবং দুনিয়ার কিছুই তাদেরকে আলাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিরত রাখে না। তারা আলাহর দেওয়া সমস্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত অনুগ্রহ অকাতরে ত্যাগ করতে পারে এবং বিনা দ্বিধায় তাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে। অপরপৰে, এর বিপরীত ব্যবহার এ কথাই প্রকাশ করে যে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ এখনও আলাহকে বিক্রয় করেনি। ঈমানের এমন দুর্বলতা পরজীবনে চিহ্নিত করে রাখা হবে।

"বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যার অচল হওয়ার ভয় তোমরা কর এবং প্রিয় বাসস্থান-সমূহ যদি তোমাদের নিকট আলাহ তাঁর রাসূল ও আলাহর রাস্তায় জিহাদ করা অপেৰা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে অপেৰা কর আলাহর আদেশ আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আলাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ২৪)

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবীদের ঈমান এতই দৃঢ় ছিল যে, তাঁরা শুধুমাত্র যে কখনো যুদ্ধ করতে প্রত্যাখ্যান করেননি তাই নয়, বরং সেখানে কিছু সংখ্যক এমনও ছিলেন যারা এমনকি মুহাম্মদ (সঃ) এঁর সাথে যুদ্ধে যেতে না পেরে কাঁদতেন। নিচের আয়াতে আলাহ যারা আন্তরিক ও যারা দ্বিধাগ্রস্ত, তাদের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন:

"তাদের কোন দোষ নেই, যারা দুর্বল, অথবা অসুস্থ, অথবা যারা কোন পাথেয় যোগাড় করতে পারেনি, যদি তারা আলাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত থাকে। সৎকর্মশীলদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই, আলাহ ৰমাশীল, পরম দয়ালু। তাদের বির“দ্ধেও কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না', তারা অশ্র“বিগলিত নেত্রে ফিরে গিয়েছিল, কারণ তাদের অর্থ ব্যয় করার মত সামর্থ ছিল না। যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল, তারা অবশ্যই দোষী। তারা পেছনে অবস্থানকারীদের সাথেই থেকে যেতে চেয়েছিল, আলাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছিলেন, তাই তারা জানে না।" (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৯১-৯৩)

কোন দুর্বলতা নয়, দুঃখ নয়, নয় কোন হতাশা

মু'মিনদের জন্য রয়েছে আলাহর পথে দীর্ঘ এবং কঠিন জিহাদ। তাদের পথ উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত বহুসংখ্যক শত্র“ দ্বারা অবর“দ্ধ হতে পারে। যাই হোক না কেন, যতৰণ পর্যন্ত তারা আলাহর পথে থাকবে, অবধারিত ভাবে মু'মিনরা শত্র“দের উপর বিজয়ী হবে।

তাদের বিজয়ের একটি কারণ হচ্ছে, মু'মিন হিসাবে তারা বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটা এমন একটা কিছু যা অবিশ্বাসীরা করতে পারে না, কারণ দুনিয়ার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার ফলে তারা আলাহর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকে। তাদের রয়েছে ভয় ও দুর্বলতা, এবং তারা যখন যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন হতাশ হয়ে পড়ে। অপরপৰে, মু'মিনরা কখনও দুর্বল হয় না কারণ তারা জানে যে আলাহ সবসময় তাদের সাথে আছেন এবং তারাই শেষ পর্যন্ত সফলকাম হবে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে:

" যত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু সুপণ্ডিত ধার্মিক মানুষ। আলাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা দমে যায়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আলাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪৬)

তবে এই উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য মু'মিনদের প্রার্থনা করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ চিত্ত-দৌর্বল্যের শিকার হওয়া খুবই সহজ–শয়তান সেজন্য কঠোর চেষ্টায় লিপ্ত। কোন এক সঙ্কট মুহূর্তে, মুনাফিকরা নবী মুহাম্মদ (সঃ) এঁর সাহাবাদের বলেছিল: "হে ইয়াসরিব (মদিনা) বাসীগণ! এখানে তোমরা (শত্র“দের বির“দ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না! সুতরাং ফিরে চল!" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১৩), এভাবে হতাশার একটি আবহ সৃষ্টি করে পরিণতিতে পরাজয় আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআন এসমস্ত দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে মু'মিনদের সতর্ক করে দিয়েছিল: "অতএব ধৈর্যশীল হও, আলাহর প্রতিশ্র“তি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।" (সূরা আর-র“ম, ৩০ : ৬০)

মু'মিন কেবল নিজের কাজের জন্যই দায়ী এবং অন্যের দুর্বলতা দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। শত্র“র শক্তি ও ৰমতাও তাকে যেন প্রভাবিত ও ভীত না করতে পারে। মু'মিনের সমস্ত জীবন আলাহর জন্যই, এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দোয়া করে যাবে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

"আর তোমরা দুঃখিত হয়ো না এবং হতাশও হয়ো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৩৯)
"আর শত্র“র অনুসরণে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলো না, যদি তোমরা দুর্ভোগ সহ্য করে থাকো, তারাও তো তোমাদের মতই দুর্ভোগ সহ্য করছে, কিন্তু তোমাদের জন্য আলাহর কাছে থেকে রয়েছে আশা, যা তাদের নেই। বস্তুতঃ আলাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা, ৪ : ১০৪)

সালাতে বিনয়াবনত হওয়া

সালাত এজন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তা হচ্ছে একজনের মুসলিম হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু যে সব সালাত আন্তরিকভাবে আদায় করা হয় না, সেগুলিকে কুরআন অনুমোদন করে না:

"সুতরাং দুর্ভোগ সে সমস্ত নামায আদায়কারীদের, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা করে লোক দেখানোর জন্য।" (সূরা আল-মাউন, ১০৭ : ৪-৬)

এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের নিয়মিত সালাতের পূর্ণতার জন্য সালাতের মধ্যকার আনুষ্ঠানিকতা, যেমন রুকু, সিজদা এগুলো যথেষ্ট নয় বরং সালাতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে সালাত আদায়কারীর উদ্দেশ্য এবং সালাতের প্রতিটি অংশে তার অন্তরের অবস্থা। কিছু লোক সালাত আদায় করে সে 'মুসলিম' এটা দেখানোর জন্য। কিন্তু এর ফলে আলাহর কাছে কিছু অর্জনের পরিবর্তে তারা বিরাট জুলুম করে চলেছে।

আমাদের সালাতকে যা পরিশুদ্ধ করে তা হচ্ছে আমাদের সচেতনতা যে আমরা নিজেদেরকে আলাহর সম্মুখে অবনত করি শুধু তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য। সেজন্যই আলাহ মু'মিনদের আদেশ করেছেন "আলাহর সম্মুখে দাঁড়াও আদবের সাথে" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৮)। আরেকটি আয়াত মু'মিনদের বর্ণনা এভাবে দিচ্ছে "যারা তাদের সালাতে বিনয়াবনত" (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ২)।

এই আয়াতে বিনয়াবনত বলতে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়কে এবং একজনের অন্তর ভীতিপূর্ণ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের সালাত ঈমান ও আলাহর নৈকট্য বৃদ্ধি করে। এটি মানুষকে দৃঢ়তা দেয়। আরেকটি আয়াতে নিয়মিত সালাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (কুরআন) তা আবৃত্তি কর এবং নিয়মিত সালাত কায়েম কর। কারণ সালাত অশীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নিঃসন্দেহে আলাহর যিকরই সর্বোত্তম। তোমরা যা কর আলাহ তা জানেন।" (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫)

আলাহর প্রশংসা করা

এ পর্যন্ত ঈমান-সম্পর্কিত যেসব বিষয়বস্তু আমরা উলেখ করেছি, তার জন্য প্রয়োজন আলাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, তাঁরই জন্য বাঁচা এবং জিহাদ করা। এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না "যিকর ও তওবার" মাধ্যমে আলাহ ও তাঁর সুন্নাহর (পথ) সাথে নিকট সংস্পর্শ তৈরি না হবে। মু'মিনদের উচিত সর্বদাই তাদের স্রষ্টাকে স্মরণ করা, তাঁর প্রশংসা করা এবং অনুতাপের মাধ্যমে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে:

"মু'মিনগণ! আলাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, সদাসর্বদা।" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪২)

এভাবেই মু'মিন নবী ইবরাহিম এর মত "আলাহর বন্ধু" হিসাবে রূপান্তরিত হতে পারবে।

অনুরূপভাবে, মু'মিনদের উচিত তাদের প্রতি আলাহর যে সব অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা, এবং তাদের অসৎকর্মের জন্য আলাহর কাছে অনুশোচনা করা। তা ছাড়াও তারা তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আলাহর কাছে চাইবে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে যত বেশি সম্ভব।

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, সবিনয়ে ও সশ্রদ্ধচিত্তে অনুচ্চস্বরে স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায় এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল আ'রাফ, ৭ : ২০৫) আলাহর স্মরণ ছাড়া সব ইবাদতই অর্থহীন। যদি এ সব ইবাদত আলাহর স্মরণ ব্যতিরেকেই এবং তাঁর সন্তুষ্টির আকাজ্ঞা ছাড়াই সম্পন্ন হয়, এগুলি প্রতিদান-বিহীন কাজে পরিণত হতে পারে। যখন কুরআন আমাদের কাছে নবীদের গুণাবলী বর্ণনা করে, তখন তাঁরা কিভাবে আলাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সে বিষয়টিতেই জোর দেওয়া হয়। ৩৮ নং সূরা (সাদ) এর ৩০ নং আয়াতে আলাহ বলেন: "আমি দাউদকে দান করেছিলাম সুলাইমান-এর মত পুত্র – কত উত্তম দাস ছিল সে, সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।" নবী আইয়ুব সম্পর্কে আলাহ বলেন: "আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম দাস ছিল সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।" (সূরা সাদ, ৩৮ : ৪৪)

প্রতিকূল অবস্থায় আলাহকে স্মরণ করা

আলাহর ইবাদতই হচ্ছে মু'মিনের জীবনের লক্ষ্য। এই ইবাদতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পন্থা হচ্ছে আলাহর বাণী সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং শয়তানের সঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই সংগ্রাম সাধারণতঃ দুঃসহ ও কঠোর, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "শয়তানের সহচররা" উন্নততর অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত থাকে।

মু'মিনরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কারণ তারা এই বিশ্বের পরিচালনার সত্যিকার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত। এবং এই বাস্তবতাই তাদের বলে দেয়, সংখ্যা বা শক্তির আধিক্য বিজয় নিশ্চিত করে না, বরং আলাহর ইচ্ছা এবং আদেশই সবকিছুর নিয়ন্তা। বস্তুতঃ সত্য দ্বীন ঈমানের বহু বিজয় দ্বারা পূর্ণ: "আলাহর অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেছে। এবং আলাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৯)

বিশুদ্ধ ঈমানই বিজয়ের পথে নিয়ে যায়। এই রহস্যময় সত্য, যা অবিশ্বাসীরা বুঝতে অক্ষম, নিচের আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হও, দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা কর, এবং আলাহকে ডাক খুব বেশি করে, যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৪৫)

আলাহর কালাম তিলাওয়াত করা

কুরআনের ৭৩ নং সুরার (আল-মুয্যাম্মিল) ৭ নং আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, দিনের বেলায় মু'মিনদের জন্য রয়েছে নানা কর্মব্যস্ততা। অবশ্যই এ সমস্ত কাজকর্ম দ্বীনের উপকারের জন্য যদিও মু'মিনরা তা অনৈসলামী পরিবেশে অবিশ্বাসী সমাজের মাঝে সম্পন্ন করে থাকে।

এমন দুনিয়াবী কাজ-কারবারের মাঝেও মু'মিনরা আলাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং কখনো এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্মৃত হয় না।

"সে সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আলাহর স্মরণ থেকে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না , তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে।" (সূরা আন-নূর, ২০ : ৩৭)

এই গুণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আলাহর কালাম মনে রাখা। কুরআনে, এই অভ্যাসের উপর পরবর্তী আয়াতটির মাধ্যমে জোর দেওয়া হয়েছে :

"আলাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আলাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৪) যতদিন মু'মিনরা কুরআনের আয়াত মনে রাখবে, তারা দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করতে পারবে এবং ফলশ্রুতিতে তারা আলাহর নৈকট্য অনুভব করবে।

অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা

মু'মিনরা বাজে এবং অর্থহীন কথা ও কাজে উৎসাহী নয়। এসবের মাঝে তারা কোন তৃপ্তি পায় না এবং এসবই তাদের কাছে মূল্যহীন। তারা তখনই কোন জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হয় যখন তার মাঝে আলাহর পথে কাজে লাগার মত কিছু থাকে। সেজন্যই কুরআনে মু'মিনদের বর্ণনা করা হয়েছে এমন মানুষ হিসাবে যারা "অসার কথাবার্তা পরিহার করে চলে।" (সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩ : ৩)

উপরের আয়াতে একথাই জোরদার হচ্ছে যে, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি কোন ধরনের বাজে কথা বা ঘটনার সংস্পর্শে আসবে, সে সেসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন কোন কাজে লেগে যাবে যা আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয়। আলাহকে খুশী করার এটাই সঠিক পথ। এজন্য বিশ্বাসীরা সবসময় সতর্ক থাকবে, এবং তারা কি করছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তাদের পক্ষে অজ্ঞ অগভীর জ্ঞান-সম্পন্ন লোকদের সাথে তর্ক করা সাজে না, যদি না তা থেকে আলাহর পথে কিছু অর্জিত হওয়ার আশা থাকে। কুরআনে আদর্শ আচরণ কি হবে তা বলা হয়েছে :

"তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা পরিহার করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী , তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গী হতে চাই না।'" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৫)

"যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭২)

যখন একজন বিশ্বাসী তার বর্তমান কাজ সম্পন্ন করে, তার উচিত আরেকটি কাজে লেগে যাওয়া। যেমন এই আয়াতটিতে বলা হচ্ছে : "অতএব, যখন অবসর পাও পরিশ্রম কর, এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।" (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৭ : ৮)

মধ্যপন্থী হওয়া

মধ্যপন্থী আচরণের জন্য দরকার কুরআনে বর্ণিত সীমার ভিতরে থাকা: অর্থাৎ যা কিছু হালাল তা করা ও যা কিছু হারাম, তা বর্জন করা। এ জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। যখন মু'মিনরা কোন ধর্মহীন সমাজে বাস করে, তাদের কখনো সে সমাজের সদস্যদের মত আচরণ করা উচিত নয়। তারা সবসময় কুরআনের আদেশ মেনে চলবে, তাদের আচরণে পরিমিতি বজায় রেখে।

এটা যে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের নিজেদের সমাজ ছাড়া অন্য সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা নয়, নিজেদের মাঝেও তাদের এ ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এমন অনেক পরিস্থিতি আসতে পারে যেখানে ভদ্রতা বজায় রাখার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে: "হে মু'মিনগণ! তোমাদের কণ্ঠস্বর রাসূল (সঃ) এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না বা যেভাবে নিজেদের মাঝে কথা বলো সেভাবে তাঁর সাথে চড়া গলায় কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২)

তা ছাড়াও অনুমোদিত কাজকর্মের বেলাতেও চরমপন্থী আচরণ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ একই ধরনের আচরণ সব পরিস্থিতিতে মানানসই নয়। কথা বলার ভঙ্গি বা ব্যবহার কখনো কখনো "অপ্রযোজ্য" বা "বেঠিক" হতে পারে, যদিও তা নিষিদ্ধ না হতে পারে। সেজন্য মু'মিনরা উচ্চকণ্ঠে কথা বলা বা কোন ধরনের কড়া ব্যবহার এড়িয়ে চলবে। সে তার নিজের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে সে না ঘাবড়ায় বা উত্তেজিত না হয়ে পড়ে, বা কখনোই মেজাজ খারাপ না করে, বা খারাপ ব্যবহার না করে। কুরআন সেসব আচরণ অনুমোদন করে না যা সবসময় পরিমিতিবোধ বজায় রেখে করা হয় না: "পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ আছে, নিশ্চয়ই আলাহর জন্য তা সহজ। তা এজন্য যে, তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না

হও, এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল না হও। আলাহ ভালবাসেন না উদ্ধত অহংকারীদের।" (সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৩)

ফেরেশতারা সাক্ষী

লোকে মনে করে যে তারা একেবারেই 'একা' যখন অন্য কেউ তাদের দেখে না। এটা আসলে সত্যি নয়। প্রথমতঃ আলাহ্ আমাদের সাথে আছেন, এবং আমরা যা কিছু করি তার সবই তিনি দেখেন ও শোনেন। তার উপর, আরো কিছু অদৃশ্য সাক্ষী আছেন আমাদের পাশে যাঁরা কখনো আমাদের ত্যাগ করেন না। তাঁরা আমাদের অভিভাবক ফেরেশতা, যাঁরা আমাদের সব কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। কুরআন আমাদের এই রহস্য সম্পর্কে জানাচ্ছে:

"আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। জেনে রেখ, দুটি ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে।" (সূরা কাফ, ৫০ : ১৬-১৮)

শেষ বিচারের দিনে যখন মানুষকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তখন ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত তার কাজকর্ম প্রকাশ করা হবে। সেদিন কি ঘটবে তা কুরআন বর্ণনা করেছে:

"যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুলচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেওয়া হবে সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল, সে ভাবত যে সে কখনই আলাহর কাছে ফিরে যাবে না, না, তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৭-১৫)

লেন-দেন লিখে রাখা

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বিস্মৃতিপ্রবণ। আলাহ সেজন্যই মু'মিনদের আদেশ করেছেন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেদের মাঝে লেন-দেন লিপিবদ্ধ করতে।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ-সংক্রান্ত কারবার করবে তখন তা লিখে রেখো এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আলাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আলাহকে ভয় করে। এবং কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এবং তোমাদের পছন্দমত দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীকে (সাক্ষী করে নেবে), স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাকে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা অস্বীকার না করে। আর দেনা কম হোক, কিংবা বেশি হোক, মেয়াদ (নির্দিষ্ট সময়সহ) লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আলাহর নিকট এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর, তা তোমরা লিখে না রাখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতি কর তবে এ তোমাদের জন্য জুলুম, তোমরা আলাহকে ভয় কর। বস্তুতঃ আলাহই তোমাদের শিক্ষা দেন। আলাহ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৮২) আরেকটি আয়াতে, একথা বলা হয়েছে যে ঋণ মাফ করে দেওয়া উত্তম।

"যদি ঋণগ্রহীতা অভাবী হয়, তবে তাকে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৮০)

এমন কিছু বলা যা কেউ নিজে করবে না

মু'মিনরা তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বাধ্য, ঠিক যেমন কুরআনে আদেশ করা হয়েছে: "প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, কারণ প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (শেষ বিচারের দিনে)।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩৪)

বিশ্বস্ততা মু'মিনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের একটি। সমস্ত রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের সততার প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং বিশ্বস্ত ও নম্র মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বিশ্বস্ততার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মু'মিনদের উচিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা এবং এমন কোন অঙ্গীকার না করা যা তারা রাখতে পারবে না। কুরআনে একথা এভাবে বলা হয়েছে:

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আলাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-সফ, ৬১ : ২-৩)

মু'মিনদের মাঝে কোন কলহ নয়

মু'মিনদের সাফল্যের একটি গোপন রহস্য হচ্ছে তাদের ভিতরের আন্তরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি। কুরআন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়: "নিশ্চয়ই আলাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে এমনভাবে যে তারা যেন একটি সুদৃঢ় প্রাচীর।" (সূরা সফ, ৬১ : ৪)

যে সব বিবৃতি বা আচরণ এই সৌহার্দ্যকে নষ্ট করে, তা দ্বীনের বিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে। আলাহ কুরআনে মু'মিনদেরকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন:

"এবং আলাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হবে। ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আলাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আনফাল, ৮ : ৪৬)

সেজন্য আন্তরিক বিশ্বাসীগণ বিবাদে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে, এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে যাতে তার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগতে পারে। অধিকন্তু, তাদের মাঝে সৌহার্দ্য ও আস্থা বৃদ্ধির ব্যাপারে সে চেষ্টা করবে। কুরআনে আমরা পরিষ্কার নির্দেশ পাই:

"আমার বান্দাদের বলে দাও তারা যেন যা উত্তম তা শুধু বলে। শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫৩)

যদি একজন মু'মিন তার ভাইয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তবুও সে তার সাথে নম্র আচরণ করবে এবং ভদ্রভাবে কথা বলবে। পারস্পরিক চিন্তাভাবনায় শরীক হওয়ার ভিত্তি হবে 'পরামর্শ', 'বিতর্ক' নয়। দুজন মুসলিমের মাঝে যদি বিরোধ দেখা দেয়, তখন কি করতে হবে তা নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে: "মু'মিনরা একে অপরের ভাই, সুতরাং বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন কর, এবং আলাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পার।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

এটা খেয়াল রাখা উচিত যে সামান্য বিতর্কও আলাহর পথে কাজ করার ব্যাপারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তানের বিরুদ্ধে আলাহর আশ্রয় চাওয়া

কুরআন হচ্ছে আলাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হেদায়েত বা পথ-নির্দেশনা। কুরআন মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, সাথে সাথে তা অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানের স্বরূপ তুলে ধরে।

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক, যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিৎনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আলাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৭)

এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের কিছু আয়াতের এই ক্ষমতা রয়েছে যে তা "যাদের অন্তর বিকারগ্রস্ত" তাদের সীমালঙ্ঘনের স্বরূপ উদঘাটন করে এবং মু'মিনদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি করে।

এটা লক্ষণীয় যে, কেউ তার ঈমানে অবিচল থাকার গ্যারান্টি দিতে পারে না। শয়তানের প্ররোচনায় বিশ্বাসীরা কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হতে পারে। শয়তানের প্রভাবে দোদুল্যমান অন্তরে কেউ কুরআন পাঠ করলে তা তার হৃদয়ঙ্গম হবে না। তাই কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে মুমিনরা যেন আলাহর কাছে শয়তানের কুপ্রভাব থেকে আশ্রয় চায় আলাহ এ হুকুম করছেন: "যখন তোমরা কুরআন পাঠ কর, আলাহর আশ্রয় চাও প্রত্যাখ্যাত শয়তানের কাছ থেকে।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৮)

আলাহর এই হুকুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে তা মু'মিনকে শয়তানের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও অবিরাম প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে শয়তান সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছে, আলাহর সরল পথের উপর মানুষের জন্য অপেক্ষায় থেকে এবং তাদেরকে আক্রমণের চেষ্টা করে "তাদের সম্মুখ থেকে এবং পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে।" কুরআনের বহু আয়াতে শয়তানের এসব কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের মাধ্যমেই শয়তানের ধোঁকা থেকে উদ্ধার পেতে হবে, যা আমাদেরকে শয়তানের কলাকৌশল সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে বলে। সূরা হিজরের ৪২ নং আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, "আলাহর বান্দাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই।" এর সমাধান হচ্ছে কুরআনকে একমাত্র পথ-প্রদর্শক হিসাবে নেওয়া এবং কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে প্রত্যাখ্যাত শয়তানের বিরুদ্ধে আলাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

বিবেচক হওয়া

ধর্মহীন সমাজের সদস্যরা মূলতঃ রূঢ়, বেপরোয়া এবং অবিবেচক হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে অবিশ্বাসীদের অহংবোধ। তারা তাদের নিজেদের লাভের কথাই শুধু চিন্তা করে। অন্যের কোন গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

সে যাই হোক, প্রকৃত মু'মিনদের একটি দল এ ধরনের লোকেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ মু'মিনদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের লোভ-লালসার শিকার না হওয়া। যেসব মু'মিন নিজেদের অসার বাসনাকে অতিক্রম করতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই তারা অপর মু'মিনদের প্রতি যত্নশীল ও বিবেচক হবে। কুরআনে এরকম নিঃস্বার্থ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে–যাঁরা মুহাম্মদ (সঃ) এঁর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং মদীনার বিশ্বাসীরা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন:

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীর যে সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। তারা মুহাজিরদের নিজেদের উপর স্থান দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর, ৫৯ : ৯)

এই আয়াতে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, মু'মিনদের উচিত তাদের নিজেদের উপর অন্য মু'মিনদের প্রাধান্য দেওয়া। এটাই প্রকৃত ঈমান, আত্মসমর্পণ ও ভ্রাতৃত্ব। অন্য মু'মিনদের প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ কেবল শারীরিকভাবে সাহায্য করার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। ভ্রাতৃত্ব সূক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। একজন মু'মিন তার ভাইয়ের প্রয়োজন ও সমস্যাকে নিজের প্রয়োজন ও সমস্যার চেয়ে বেশি বিবেচনা করবে।

রূঢ় এবং অবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার একজনের ঈমানের ঘাটতিই প্রকাশ করে। কেউ যদি বুঝতে না পারে যে তার আচার আচরণের প্রভাব অন্য মু'মিনের উপর কি হবে এবং সে শুধুমাত্র নিজের 'ইচ্ছা' এবং 'পছন্দ' মত কাজ করে, সে আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত মু'মিনের উদাহরণ থেকে বহুদূরবর্তী। কুরআন ঐ বিষয়টিকে বহু বিবেচনাপূর্ণ ও বিবেচনাহীন আচরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জোর দিয়েছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) প্রতি বিনয়াবনত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া:

"হে বিশ্বাসীগণ! কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে নবী গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যেও, তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ তা নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিবাহ করা কখনো সঙ্গত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৫৩)

যারা কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত, তারা মহৎ, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেচক। এটাই মু'মিনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, সে তার নিজের ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং সে আল্লাহকে ভালবেসে খাদ্য দান করে নিঃস্ব, ইয়াতীম ও বন্দীকে। বিবেচক হওয়া জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য। যেমন, গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত কোন ভাইকে বিরক্ত না করা, মু'মিনদের সালাতের সময় চুপ থাকা, অন্যের আরামের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জেনে নেওয়া এবং চাওয়ার পূর্বেই তাদের প্রয়োজন পূরণ করা–এগুলি হচ্ছে সদয় ব্যবহারের উদাহরণ। যাই হোক, এগুলি অল্প কিছু উদাহরণ মাত্র, এ ধরনের বিবেচনাপূর্ণ আচরণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শত-সহস্র পাওয়া যেতে পারে।

অজ্ঞদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা

কুরআনে মু'মিনের বর্ণনা নিচের আয়াতে দেওয়া হয়েছে: "তারাই রহমানের বান্দা যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা প্রশান্তভাবে জওয়াব দেয়।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩)

"তারা যখন অসার কাব্য শ্রবণ করে তখন তা পরিহার করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।'" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৫)

বিশ্বাসীরা অন্তরে শান্তিপ্রিয়, যেখানে অবিশ্বাসীরা চূড়ান্তভাবে অত্যন্ত স্বস্তিহীন, অস্থির ও আক্রমণাত্মক। যেন জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য ইতিমধ্যেই এই পৃথিবীতেই শুরু হয়ে গেছে। সেজন্যই তারা ঝামেলা সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও অনবরত সংকটের সম্মুখীন হয়। যাই হোক, বিশ্বাসীরা কখনো এ ধরনের লোকের সাথে যোগাযোগ রাখে না যদি না তারা মু'মিনদের ও ইসলামের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়। তারা মর্যাদাব্যঞ্জক ব্যবহার করে, যেমনটি কুরআনে বর্ণিত আছে। যখন হস্তক্ষেপ করা জরুরী হয়ে পড়ে, তারা রূঢ় ব্যবহার করে না, বরং অত্যন্ত সভ্য ও আইনসঙ্গত পন্থায় আচরণ করে।

অজানা বিষয় সম্পর্কে তর্ক না করা

কুরআনে মানুষকে সাধারণভাবে "অধিকাংশ ব্যাপারে বিবাদ প্রিয়" (সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৫৪) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে এই সমালোচনা বিশেষভাবে অবিশ্বাসীদের প্রতিই করা হয়েছে:

“যখন মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়, এবং বলে, 'আমাদের দেবতারা শ্রেষ্ঠ না ঈসা?' এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ এরা তো এক বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।” (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৫৭-৫৮)

এই বিতর্ক-প্রবণতার পিছনে যে কারণ রয়েছে তা হচ্ছে কলহের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা - ভিন্ন মতকে প্রকাশ করা বা তার মূল্যায়ন করা নয়। অজ্ঞদের বিবাদের মধ্যে কোন পক্ষই অপর পক্ষের বক্তব্যকে মূল্যায়নের চেষ্টা করে না অথবা সঠিক সমাধান বের করতে চেষ্টা করে না। অপর পক্ষকে পরাজিত করা একমাত্র লক্ষ্য থাকে। এ ধরনের তর্কের সময় চড়া গলা এবং মারমুখী মনোভাবের এটাই ব্যাখ্যা, এবং যার মোড় সহজেই ঘুরে গিয়ে তর্ক থেকে কলহে পর্যবসিত হতে পারে।

এটা অবশ্যই অস্বাভাবিক সেসব বিষয় নিয়ে তর্ক করা যার জ্ঞান কোন পক্ষই রাখে না। এর সর্বাধিক সুস্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ধর্ম নিয়ে আলোচনা, যেখানে আলোচকগণ সাধারণভাবে অতিশয় অজ্ঞ। এ ধরনের আচরণের ভ্রান্তি নিচের আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে: “দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? বস্তুতঃ আলাহ সর্বজ্ঞাত, তোমরা জ্ঞাত নও।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৬৬)

কোন উপহাস নয়

পরবর্তী আয়াতটি আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে মু'মিনদের পরস্পরের মাঝে কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা উচিত নয়: “হে বিশ্বাসীগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেউ বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।” (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

আলাহ মানুষকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। উপহাসের নানা ধরন থাকতে পারে: ব্যক্তিগত দুর্ভোগ দেখে উপহাস করা, ধূর্ততার সাথে দাঁত বের করে হাসা, কৌতুকের ছলে মৌখিক ব্যঙ্গ করা, অথবা বাঁকা চোখে তাকানো এমন কিছু বোঝাতে যা প্রকাশ্যে আলোচনা করা যাবে না ইত্যাদি। এরকম ব্যবহার অজ্ঞ লোকদের সংস্কৃতির অঙ্গ এবং সত্যিকার মু'মিনদের জন্য বেমানান। কুরআন বলছে যে, যে সমস্ত লোক এ ধরনের আচরণে লিপ্ত থাকে, তারা আলাহর আগুনের এমন আযাব ভোগ করবে যা তাদের অন্তরকে গ্রাস করবে।

“দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বার বার গণনা করে, সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, হুতামা কি তা কি তুমি জান? এ আলাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করে, এ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভে।” (সূরা হুমাযাহ, ১০৪ : ১০৯)

আলাহর এই স্পষ্ট হুকুম জানার পর কোন মু'মিনের পক্ষেই বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই কোন মু'মিন ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ব্যবহার করে না। যদি কখনো কোন মু'মিন এরকম ব্যবহার করে থাকে, হয়তো সে তার আচরণের ভুল সম্পর্কে না জেনে মজা করার জন্য এমন করে থাকবে। কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারবে যে সে যা করছে তা ভুল, তার উচিত তৎক্ষণাৎ এমন কাজ বন্ধ করা এবং তওবা করা।

মু'মিনদের ডাক নামে না ডাকা

অবিশ্বাসীদের অভ্যাস হচ্ছে যে অন্যকে অপমানজনক ডাক নাম ধরে ডাকা। এর পেছনে যে মনোভাব তা হচ্ছে অপরকে ছোট করা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব 'জাহির' করা। অতীত ভুল-ভ্রান্তি বা শারীরিক দোষ-ত্রুটির প্রতিই ডাক নাম ইঙ্গিত করে থাকে। অবিশ্বাসীরা অসৎকর্ম ভুলে যায় না এবং সংশিষ্ট ব্যক্তিকে সবসময়েই তার ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও হয়তো লোকটি আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করেনি।

যাই হোক, মু'মিনরা তাদের চেয়ে ভিন্ন। তারা ক্ষমাশীল, এবং তাদের মাঝে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, তারা এরকম আচরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে না। তা ছাড়াও, আলাহ বিশ্বাসীদের আদেশ দিয়েছেন “তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দনামে ডেকো না।” (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

বিশ্বস্ত হওয়া বা আমানতদার হওয়া

কুরআন নির্দেশ দেয় যথার্থ অধিকারীর হাতে তার প্রাপ্য আমানত প্রত্যার্পণ করা, যা একটি নৈতিক বিধান এবং সাফল্যের পথ। মু'মিনদের সবসময়ই তাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকা উচিত এবং পরিবর্তে অন্যদের আস্থা অর্জন করা উচিত। এ ছাড়াও মু'মিনদের নির্ধারণ করতে হবে কাকে আমানত ফেরত দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কে এর অধিকারী। এ ব্যাপারে কুরআন নিম্নের হুকুম জারী করেছে:

“আলাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আলাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আলাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।” (সূরা আন-নিসা, ৪ : ৫৮)

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

"যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সাবধান হয়ে চলে, নিশ্চয় আলাহ সাবধানীদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৭৬)

আমানত এমন কোন বস্তু হতে পারে যার আর্থিক মূল্য আছে অথবা তা কোন কাজ অথবা কোন দায়িত্ব। কে বিশ্বস্ত বা আমানতদার, তা নির্ধারণ করার জন্য মু'মিনদেরকে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বাছাই করার ৰমতা ব্যবহার করতে হবে।

মায়াময় বিশ্ব

ইসলামের অনুশাসন সম্বন্ধে অজ্ঞ কোন সমাজের প্রধান একটি দোষ তার সদস্যদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, স্পর্শ ও দর্শনের মাধ্যমে জানা এই বস্তুজগতকেই তারা আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় ও চরম সত্য বলে জানে। প্রকৃত পৰে তারা মনে করে বস্তুর "চিরস্থায়ী এবং অনন্ত" অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে তারা বস্তুর উপর দেবত্বারোপ করতে শুরু করে এবং সেটা থেকেই সাহায্য চায়। ফলশ্রুতিতে তারা আলাহ সম্পর্কে চিন্তা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায় এবং এমনকি তার অস্তিত্বও অস্বীকার করে বসে। তাদের ধারণায়, বস্তুর সাথে তুলনায় আলাহ হচ্ছেন "কম বাস্তব এবং বেশি কাল্পনিক"। যাই হোক, অবিশ্বাসীর জন্য এটা একটা বিরাট ভুল ধারণা। পরম সত্তা বস্তু নয়, আলাহ। কুরআন এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলছে: "এজন্য যে, আলাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য, এবং আলাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।" (সূরা আল-হাজ্জ ২২, : ৬২)

সত্য হচ্ছে যে বস্তুর ততৰণ পর্যন্তই অস্তিত্বশীল থাকার সামর্থ আছে আলাহ যতৰণ পর্যন্ত থাকার জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন। এর অস্তিত্ব সংরৰিত হয় শুধু তাঁর ইচ্ছায় এবং তাঁর আদেশে। ফলস্বরূপ বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বের স্থায়ীত্ব প্রশ্নের বাইরে: বস্তু শুধুমাত্র আলাহর 'হও' এই হুকুমেই অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। আলাহ এই সত্য কুরআনের পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

"আলাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন, যাতে তারা কৰচ্যুত না হয়, তারা কৰচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওগুলিকে ধরে রাখবে? তিনি সহনশীল, ৰমাপরায়ণ।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথিবী অস্তিত্বশীল আলাহর ধারণ ৰমতার দ্বারাই এবং যখন তিনি আদেশ করবেন, তা বিলীন হয়ে যাবে। আসলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে সমগ্র মহাবিশ্ব মায়াময় বস্তু দিয়ে তৈরি, যা নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। আলাহর এই বাধাবন্ধনহীন ইচ্ছা আমাদের বোধবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু এই সৃষ্টিকে কিছু পরিমাণে বুঝতে হলে কল্পনা হয়তো সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে , কেউ যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে ওঠে, স্বপ্নের জগত তার সমস্ত বিবরণসহ অস্তিত্ব থেকে মুছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেহেতু সে জগতের অস্তিত্ব শুধু তার মনে ঘুমের সময়ে ছিল। যখন মন এমন একটি জগত 'তৈরি' বন্ধ করে দেয়, তা হঠাৎ 'অদৃশ্য' হয়ে যায়, এবং আর কোথাও তা অস্তিত্ববান থাকে না। নিশ্চয়ই এর কোন বস্তুগত বা স্বাধীন সত্তা নেই।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম রাব্বানী, এই পরম সত্য বর্ণনা করেছেন (বর্ণনাটি অনুবাদের সময় সহজ করা হয়েছে এবং শাব্দিক পরিবর্তন করা হয়েছে - লেখক): "আলাহ তাঁর প্রতিটি নামের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছেন (সুবিচারক, পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী, পরম করুণাময় ইত্যাদি) এবং তাঁর গুণাবলী তাঁর সৃষ্টিকে দান করেছেন। এবং এই প্রতিচ্ছবির জন্য যে সত্তা সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল শূন্যতা থেকে। একক এবং অংশীবিহীন আলাহ তাঁর ৰমতার দ্বারা তাঁর নামসমূহ বাস্তবায়নের একটি স্থান চিন্তা করে তা মায়াময় (কাল্পনিক, ধরে নেওয়া) বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়াও তিনি এটা তাঁর পছন্দমত সময়ে এবং আকৃতিতে তৈরি করেছেন।

এই বিশ্বের অস্তিত্ব বাহ্যিকভাবে নয়, শুধু মায়াময় এবং রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে বিরাজমান। এৰেত্রে এটি শূন্যতার মাঝে একটি স্থায়ীত্ব এবং আলাহর সৃষ্টির সাথে যা কিছু অলীক তা শক্তি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তাই, সৃষ্টি সজীব হয়ে ওঠে, সে জানে, করে, জিজ্ঞাসা করে, দেখে, শোনে এবং কথা বলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। যা হোক, যেহেতু এটা প্রতিচ্ছবি মাত্র এবং শুধুমাত্র ছায়া অস্তিত্বের অধিকারী, এর কোন বাহ্যিক প্রকাশ নেই। বহির্জগতে, আলাহর সত্তা ও তাঁর নামসমূহ ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রতিটি বস্তুই শ্রেষ্ঠতম সত্তার আয়নায় প্রতিফলিত এবং তারা এভাবে বাহ্যিক উপস্থিতি অর্জন করেছে, তাদের দেখে মনে হয় তারা বাইরের পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল। কিন্তু এ ছাড়া বাইরে আর কিছুই নেই। আলাহ ছাড়া কেউ নেই এবং কিছু নেই।" (মাকতুবী রাব্বানী, ইমাম রাব্বানী, পৃষ্ঠা ৫১৭-৫১৯)

যেহেতু আলাহ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই এবং বিশ্বের সমস্ত কিছুই তাঁর সত্তার বহিঃপ্রকাশ, সমস্ত কাজের স্রষ্টাও আবার সেই সর্বশক্তিমান। কুরআনে এই সত্য কয়েকটি আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে:

"তোমরা তাদের হত্যা করনি, আলাহই তাদের হত্যা করেছেন, এবং তুমি যখন (ধূলি) নিৰেপ করেছিলে তখন তুমি নিৰেপ করনি, আলাহই নিৰেপ করেছিলেন, এবং তা বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিশ্চয় আলাহ সর্বশ্রোতা, সর্বোচ্চ।" (সূরা আল-আনফাল, ৪ : ১৭)

"আলাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না, নিশ্চয়ই আলাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-ইনসান, ৭৬ : ৩০)

"স্মরণ কর, বস্তুতঃ যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক করে দেখিয়েছিলেন। এবং আলাহর দিকেই সকল কর্মের শেষ গতি।" (সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৪৪)

বিশ্বের একটি অন্তর্চেহারা আছে প্রত্যক্ষ চেহারার মত। প্রত্যক্ষভাবে সবকিছুই স্বাধীন এবং অনিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে, তাদের সৃষ্টির অলীকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সবকিছুই আলাহর ইচ্ছার সামনে মাথা নত করে। কুরআনের কথায় বলতে গেলে: "আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আলাহর উপর, এমন কোন জীব-জন্তু নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।" (সূরা হুদ, ১১ : ৫৬)

আলাহ ছাড়া কিছু নেই একথা জানার পর এই গোপন সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে কেউ নিজে থেকে কোন কিছু করতে পারে না। মু'মিনদের অন্তরে এই গোপন সত্য সবসময় জাগ্রত থাকা উচিত। সে অনুযায়ী মু'মিনরা জানে যে অবিশ্বাসীদের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসৎকর্মও আলাহরই ইচ্ছানুসারে হয়। সেজন্য মু'মিনরা সমস্ত ঘটনাকে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুযায়ী মূল্যায়ন করে। এটা তাদেরকে সঠিক কাজ করতে এবং সর্বাপেক্ষা আন্তরিক, সমবেদনাপূর্ণ এবং বিজ্ঞতার সাথে আচরণ করতে সহায়তা করে।

"তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ৩২)